শ্রমিক ইস্তাহার

৩০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা জুন-জুলাই ২০০৮ শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র দাম: ১.৫০ টাকা

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ও

"বামপন্থী"দের লড়াইয়ের প্রহসন

বসাব বসাব করতে করতে মনমোহন সিং-এর "জনদরদী" কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত জনগণের ঘাড়ে খাঁড়ার কোপটা বসিয়েই দিল। একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল পেট্রল, ডিজেল আর রান্নার গ্যাসের দাম। যবে থেকে পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়ানোর কথা শুরু হয়েছে সেই থেকেই জঙ্গি বীরের ভঙ্গি করে সিপিআই(এম) আর বাদবাকি "বামপন্থী" দলগুলো "দাম বাড়ালে সরকারকে দেখে নেব" গোছের একটা ভান করছিল। দাম বাড়ার সাথে সাথে একটা বন্ধও সে সমস্ত রাজ্যে তারা করে ফেলল যেখানে সরকারে থাকার সুবিধা নিয়ে খুব সহজেই বন্ধ করে ফেলা যায়। জনদরদী সাজার এমন মওকা কি অন্যরাও ছাড়তে পারে! তৃণমূল, বিজেপিরাও তাই এই ফাঁকে একটা বন্ধ করে নিল। কিন্তু, যে লড়াই একটা বন্ধ-এ শুরু হয়ে ঐ বন্ধ-এই শেষ হয় সেটা আসলে লড়াইএর নামে একটা প্রহসন এবং সেই প্রহসনে এই পার্টিগুলোর যাই সুবিধা হোক না কেন জনগণের সমস্যার কোনও প্রতিকার হয় না। দাম যা বাড়ার তা বেড়েই গেল এবং এই বাড়তি দামটা যে গরিব মেহনতী জনগণের পকেট কেটেই প্রধানত তোলা হবে তা তো সবারই জানা। পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে গেছে। আর ক'দিন বাদে বাস-মিনিবাসের ভাড়াও বাড়তে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। যারা বন্ধ করেছিল তারা সবাই এখন স্পিকটি নট — সবাই এখন নিজের নিজের রাজ্যে বাড়তি দাম আদায়ে ব্যস্ত।

কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। সবাই তার কৃতকর্মের পেছনে কিছু না কিছু অজুহাত খাড়া করে। সেরকমই পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা যুক্তি রয়েছে। সেই যুক্তিটা হল আন্তর্জাতিক বাজারে যেভাবে তেলের দাম বাড়ছে তাতে তাদের পক্ষে তেলের দাম না বাড়িয়ে কোনও উপায় ছিল না। ওপর ওপর দেখলে যুক্তিটা যে জোরালো মনে হয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গত দু'বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় দুগুণ হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এভাবে বাড়ার পেছনে কোন খেলোয়াড়দের হাত রয়েছে, বিশাল বিশাল বহুজাতিক পুঁজিপতিদের গোষ্ঠীগুলো কীভাবে তেলের দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে সে আলাদা আলোচনার বিষয়, এখানে সে আলোচনা থাক। কিন্তু, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে তা গরিব মানুষের পকেট কেটে তুলতে হবে এটা কোন যুক্তি ? দিন-কে-দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, রোজগার আমাদের বাড়ছে তো নয়ই, বরং কার্যত কমে যাচ্ছে। আমরা গরিব মেহনতী মানুষরাই বা কোত্থেকে তেলের দামের বাড়তি বোঝা বইব ?

কিন্তু, তার থেকেও বড় কথা হল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার অজুহাতে এদেশে তেলের দাম বাড়ানোর পেছনে একটা বড় রকমের শয়তানি রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ছে ঠিকই। কিন্তু, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের যা দাম তাতে ভারতে পেট্রলের দাম হয় লিটারপিছু ২১ টাকার মতো, অথচ, এখানে তেলের দাম লিটারপিছু ৫০ টাকারও বেশি। কোথায় যাচ্ছে এই বাড়তি টাকাটা ? যাচ্ছে সরকারের ভাঁড়ারে। কারণ, পেট্রল-ডিজেলের ওপর কর বসিয়ে কোটি কোটি টাকা সরকার তার ভাঁড়ারে

জমা করছে। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই নয়, সমস্ত রাজ্য সরকারেরই রোজগারের একটা বড় জায়গা হচ্ছে পেট্রল-ডিজেলের ওপর এই কর। আর করগুলো যেহেতু দামের ওপর শতকরা হিসাবে নেওয়া হয় তাই তেলের দাম যত বাড়ে তত সরকারগুলোর রোজগারও বাড়ে। ২০০০-০১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ও সমস্ত রাজ্যসরকার মিলিয়ে তেল, গ্যাস ইত্যাদি খাতে আয় ছিল ৬৮ হাজার কোটি টাকা যা ২০০৬-০৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, এই খাতে আয় গত পাঁচ বছরে প্রায় দুগুণ হয়ে গেছে। এই তো হচ্ছে ওদের "লোকসানের" চেহারা। লোকদেখানো ছিটেফোঁটা কমানো নয়, সরকারগুলো যদি তাদের কর পুরোপুরি তুলে নেয় তাহলেই তেলের দাম এখন যা আছে তার অর্ধেক হয়ে যাবে। কিন্তু সে কাজ কোনও সরকারই করবে না। তাহলে, গরিব মানুষের পকেট কেটে বড় বড় পুঁজিপতিদের সস্তায় জমি, বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে ? গরিব মানুষকে মারার জন্য পুলিশ-মিলিটারি পোষার জন্য টাকা মিলবে কোথায় ? বড়লোকদের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে যে দেনা করা হয়েছে তা শোধ করার জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে তাই বা আসবে কোত্থেকে ? **অর্থাৎ, গরিব মানুষের পকেট কেটে বড়লোকদের স্বার্থ রক্ষা করার চিরন্তন নীতিরই ফলে তেলের দাম বাড়ছে।**

সরকার যুক্তি দিচ্ছে যে তেলের দাম না বাড়ালে সরকারি তেল কোম্পানীগুলোর অনেক লোকসান হয়ে যাবে। এটাও একটা বিরাট ধাপ্পা। ও.এন.জি.সি, ইন্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি সরকারি তেল কোম্পানীগুলো লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলোর তালিকায় একদম প্রথম সারিতেই রয়েছে। শুধু ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী গত বছরে লাভ করেছে ৭,০০০ কোটি টাকা। অবশ্য, লাভের দিক থেকে এক নম্বরে রয়েছে কোনও সরকারি কোম্পানী নয়, ভারতের বড় পুঁজিপতিদের অন্যতম রিলায়েন্স গোষ্ঠী। তারা গত বছরে লাভ করেছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। মজার ব্যাপার হল, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে এদেরই লাভ। এরা কম দামে অপরিশোধিত তেল কিনে তা শোধন করে পরে যখন পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি বিক্রী করে তখন তা করে পরের বাড়তি দামে এবং এই কায়দায় কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে। **দ্বিতীয়ত,** আন্তর্জাতিক বাজারের তেলের ওপরই আমাদের যে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়, তার জন্যই বা দায়ী কারা ? এই শাসকশ্রেণীর দলগুলোই তো সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে দেশের মধ্যে নতুন তেলের ভাণ্ডার খুঁজে বার করার কাজ লাটে তুলে দিয়েছে, যাতে তেলের জন্য আমাদের দেশকে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এরপরও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ানোর অজুহাত দেশের গরিব জনগণ মানবে কেন ? **তৃতীয়ত,** আমাদের দেশে যে দিন-কে-দিন তেলের আমদানি বেড়ে যাচ্ছে তার জন্যই বা দায়ী কারা ? বিশ্বায়নের ফলে দেশের গরিব মানুষের অবস্থা খারাপ হচ্ছে আর ফুলেফেঁপে উঠছে বড়লোকরা। তারা একটার জায়গায় দুটো গাড়ি কিনছে, রোজ রোজ নতুন নতুন মডেলের আমদানি হচ্ছে। গত পনেরো বছরে মোটরগাড়ির উৎপাদন বেড়েছে সবচেয়ে বেশি হারে। বড়লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য এবং তাদের জন্য গাড়ি তৈরি করে মুনাফা বাড়ছে বড় পুঁজিপতিদের, দেশ আরও বেশি বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তেলের আমদানির ওপর। এ-ও তো বড়লোকদের স্বার্থে নেওয়া শাসকশ্রেণীর নীতিরই ফল।

আসলে এই বড়লোকী ব্যবস্থায় সরকারগুলো যে শ্রমিক কৃষক সহ শোষিত শ্রেণীগুলোর সর্বনাশ করে দেশী-বিদেশী বড় পুঁজিপতি শ্রেণীদেরই স্বার্থরক্ষা করে চলে এই সরল সত্যকেই পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি আবারও সজোরে সামনে হাজির করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল থেকে শুরু করে "বামপন্থী" সিপিআই(এম) পর্যন্ত কোনও পার্টির সরকারের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। যে দলই সরকারে এসেছে তারাই তাদের দরকার মতো আন্তর্জাতিক বাজারের দামের অজুহাতে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়েছে। দাম যত বেড়েছে তত বেড়েছে কর বাবদ সরকারের আয়। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলোও কম যায়নি। কর বসানোর এমন সুবিধাজনক জায়গা সরকারগুলো ছাড়ে কী করে ? সিপিআই(এম) এবারে রাজ্য সরকারের কর কমিয়ে "জনদরদী" সাজার চেষ্টা করছিল। পেট্রলে লিটার পিছু ১১ টাকা ৪৪ পয়সা করের মধ্যে ২ টাকা ১২ পয়সা আর ডিজেলে ৬ টাকা ১৬ পয়সা করের মধ্যে ১ টাকা ৩৮ পয়সা কর ছাড় দিয়ে যদি জনদরদী হওয়া যায় তাহলে তো কংগ্রেস বা বি.এস.পি. ইত্যাদি দলগুলো, মায় গুজরাটের মোদী সরকারও কম জনদরদী নয়। কারণ, এই প্রতিটি সরকারই পেট্রল, ডিজেলের ওপর থেকে এক থেকে দু টাকা কর কমিয়েছে। বরং, কোনও কোনও রাজ্য সরকার রান্নার গ্যাসে কর ছাড় দেওয়াতে সে সমস্ত রাজ্যে রান্নার গ্যাসের দাম ৫০ টাকার অনেক কম বেড়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ বা দিল্লির মতো দু-একটি রাজ্যে তো এই

কর ছাড়ের ফলে রান্নার গ্যাসের দাম এক পয়সাও বাড়েনি, যেখানে পশ্চিমবাংলার সরকার রান্নার গ্যাসের ওপর এক পয়সা কর ছাড় দেয়নি। মজার ব্যাপার হল, প্রতিটি রাজ্য সরকারই বড় গলা করে ঘোষণা করছে যে এই কর ছাড়ের ফলে তাদের কত কোটি টাকা "লোকসান" হচ্ছে। ভাবখানা এমন যে তারা কত না মহানুভবতার কাজ করেছে। এই কথাটা সবাই চেপে যাচ্ছে যে এই কর ছাড় দিয়েও কত কোটি টাকা তারা জনগণের পকেট কেটে আদায় করছে, এমন কি এবারের দাম বাড়ার ফলেও যে তারা লাভ করবে এই কথাটাও বেমালুম চেপে যাচ্ছে। অবশ্য, এদের কাছে অন্য কী-ই বা আমরা আশা করতে পারি। জনগণের স্বার্থ দেখার নাম করে বড় বড় পুঁজিপতি সহ সমাজের ওপরতলাকার মানুষের স্বার্থ দেখতে গেলে এই কাজই করতে হবে।

সে জন্যে, তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি ইত্যাদি বিরোধী দলগুলো বা বিশেষ করে সিপিআই(এম) ও "বামপন্থী" বাদবাকি দলগুলো লড়াইএর নামে যা করছে তা লড়াই নয়, লড়াইএর প্রহসন মাত্র। পেট্রল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য আলাদা করে কোনও একটি দল বা তার সরকার দায়ী নয়, এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী গরিব মানুষের ওপর কর বসিয়ে বড় মালিকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী নীতি। এই সমস্ত দলগুলোর কোনওটাই বাস্তবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এই নীতির বিরোধী নয়, বরং তারা যখন সরকারে থাকে তখন তারাও একই নীতি লাগু করে। গত দশ পনেরো বছর ধরে এটা তো আমাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। সরকার বদলেছে, এক পার্টির বদলে আরেক পার্টি সরকারের ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু শাসকশ্রেণীর বিশ্বায়ন-উদারীকরণের হামলার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তা হলে এই সমস্ত পার্টিগুলো লড়াইএর এই ভান করে কেন ? করে, জনগণের ক্ষোভকে পুঁজি করে নির্বাচনে ভোট পেয়ে সরকারের গদিতে বসার জন্য। এদের লড়াইএর ভরসায় মূল্যবৃদ্ধি কমানোর কথা ভাবা মানে ওদের এই চক্রান্তের খপ্পরে পড়া এবং ওদের দ্বারা নিজেদের ব্যবহৃত হতে দেওয়া। মূল্যবৃদ্ধি শুধু নয়, বিশ্বায়ন-উদারীকরণের যে কোনও হামলাকে মোকাবিলা করার একটাই পথ — সে পথ হল এই সমস্ত পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জোরে শ্রমিক-কৃষকের নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলে লড়াই করার পথ।

কিন্তু, সেই লড়াই গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক-কৃষকের যে সংগঠিত শক্তির দরকার তা তো আজ নেই। শ্রমিক-কৃষক সহ গরিব মেহনতী মানুষ আজ অসংগঠিত, তাদের নিজেদের পার্টিটাও নেই। এই অসহায়ত্বর জায়গা থেকে কি আমরা আবারও ঐ প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলোর ওপরই ভরসা করব ? ওদের এই লড়াইএর প্রহসনকেই লড়াই বলে মনে করে তার ওপর নির্ভর করব ? তা করার মানেই হচ্ছে ওদের গদি দখলের চক্রান্তের খপ্পরে গিয়ে পড়া। তাহলে কি এর থেকে বেরোনোর কোনও পথই নেই ? আছে, সে পথ হল আগামী দিনের লড়াই গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সমস্ত পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বাধীন শক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার পথ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলো, বিশেষ করে সিপিআই(এম) বা বামপন্থী পার্টিগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে গরিব মেহনতী মানুষ নিজেরা সমস্ত প্রতিষ্ঠিত পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু একটু করে লড়াইএর ময়দানে নামছেন। তারা নিজেদের লড়াইএর সংগঠন গড়ে তুলছেন, নিজেদের লড়াই ও সংগঠনের ওপর নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছেন। এই পথই তামাম শ্রমিক-কৃষক সহ গরিব মানুষকে নিতে হবে। কিন্তু শুধু, প্রতিষ্ঠিত বেইমান পার্টিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই হবে না, সাথে সাথে লড়াইয়ের দিশাটাও ঠিক করে নিতে হবে। বুঝে নিতে হবে যে মূল্যবৃদ্ধি সহ আমাদের রুটিরুজির সমস্যাগুলোর জন্য আলাদা করে কোনও পার্টি দায়ী নয়, দায়ী শাসকশ্রেণীর নীতি যা প্রতিটি পার্টি সরকারে থেকে লাগু করে চলেছে এবং এই বড়লোকী ব্যবস্থায় যে কোনও সরকারই এই নীতি মেনে চলতে বাধ্য। সে জন্যেই সরকার বদল করেও এই নীতির কোনও বদল হচ্ছে না, ভবিষ্যতেও হবে না। এই নীতি বদলাতে গেলে বদলাতে হবে গোটা সমাজটাকেই। সমাজ বদলানোর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, শ্রেণী রাজনীতির ঝান্ডাকে হাতে নিয়েই বিচ্ছিন্ন হতে হবে প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলো থেকে, গড়তে হবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন শ্রেণী পার্টিকে। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই নিজেদের স্বাধীন শক্তিতে লড়তে হবে শাসকশ্রেণীর প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে। এই লড়াইএর অঙ্কুরগুলো দেখা দিতে শুরু করেছে, আগামী দিনে তা মহীরুহ হয়ে উঠবে, জনজাগরণের এক বিশাল ঢেউ ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে শোষকদের এবং তাদের দালাল পার্টিদের — এই প্রত্যয় নিয়ে, এই বিশ্বাস নিয়ে শ্রেণী রাজনীতির ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষকের আগুয়ান, লড়াকু সাথীদের সংগঠিত হতে হবে, সংগঠিত করতে হবে তামাম মেহনতী মানুষকে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

সি.পি.এম. বিরোধী ভোটে আটকে থাকা নয়, আরও এগিয়ে যেতে হবে

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি.পি.এম. একটা বড় ধাক্কা খেয়ে গেল। দেখে মনে হয়, ওরা ভাবেনি যে এত বড় ধাক্কা খাবে। ভাবেনি কেন কে জানে! গ্রামের মানুষ যে ওদের কাজকারবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছিল, এমনকি রাস্তায় নেমে বারবার তাদের বিরক্তি-বিক্ষোভ গত দু-আড়াই বছর ধরে বেশি বেশি করে জানান দিচ্ছিল — সে সব সি.পি.এম.-এর ছোট বড় নেতাদের অজানা ছিল এমনটা তো নয়। আসলে ত্রিশ বছর ধরে ভোট পেয়ে পেয়ে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে এবং এমন একটা জমিদারি মেজাজ তৈরি হয়ে গেছে যে প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে ওদের জমিদারিকে চ্যালেঞ্জ (ভোটবাক্সে) জানিয়ে দিতে পারে সেটা তাদের ভাবনার মধ্যে ঢুকতেই পারেনি। তবে তারা একেবারে চিন্তিত ছিল না এ কথা বলা যাবে না। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, রেশন-বিদ্রোহ ইত্যাদি তাদেরকে সত্যিই কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু জমিদার তো, হাতে তো চাবুক আছে, পাইক-বরকন্দাজ আছে — তবে চিন্তার কী! ওরা হয়তো ভেবেছিল ক্যাডার-বন্দুকবাজবাহিনী আর পুলিশ-প্রশাসনের যে জোরে এতদিন (বিশেষত গত কয়েক বছর) তলাকার মানুষকে দাবিয়ে রাখা গেছে, সেই জোরে ভোটটাও করে নিতে পারবে। এটা বলছি, তার কারণ আছে। খেয়াল করে দেখুন, রেশন-দুর্নীতি নিয়ে, রেশন-ডিলার ও পঞ্চায়েত নেতাদের (মানে পার্টি নেতাদের) যোগসাজসের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় যখন প্রায় একই সঙ্গে তলাকার মানুষের বিদ্রোহ ফেটে পড়েছিল, তখন সি.পি.এম. নেতাদের মুখে এ কথাটাই শুনেছি যে এই বেয়াদপির পেছনে রয়েছে নন্দীগ্রাম! কথাটা তারা একদিক থেকে ভুল বলেননি। সত্যিই এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে নন্দীগ্রামের মানুষ জমি অধিগ্রহণের সরকারি ফতোয়া অগ্রাহ্য করে স্বতঃস্ফূর্ত পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং সরকারকে পিছু হটাতে বাধ্য করেছিলেন সেটা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গরিব জনগণের মধ্যে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিল সি.পি.এম.-পঞ্চায়েত নেতাদের দাদাগিরি-জুলুম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সে জন্যই বলছিলাম সি.পি.এম. নেতারা ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু তারা এটা বোঝেননি বা বুঝতে চাননি যে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক অংশের মধ্যে নানা কারণে সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বিক্ষোভ জমে না থাকলে হাজারটা নন্দীগ্রামও কিছু করতে পারত না। আর এটা তারা বুঝতে চাননি বলেই তারা হয়তো ভেবেছিলেন নন্দীগ্রামকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিতে পারলেই গ্রামবাংলাকে ভয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া যাবে। এখানেই তারা ভুল ভেবেছিলেন। সরকারি প্রশাসনের মদতে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে বীভৎস সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা নন্দীগ্রাম জনগণের প্রতিরোধকে (সাময়িক) ভেঙে দিয়েছিলেন এবং নন্দীগ্রামের মানুষকে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যা ভেবেছিলেন বা চেয়েছিলেন তা হল না। অসংখ্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি ওদের হাতছাড়া হয়ে গেল, যা কয়েক বছর আগেও ভাবা যেত না। মজার কথা হল, খোদ নন্দীগ্রামে যেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে তারা ভেবেছিলেন চুটিয়ে ভোটে জিতবেন, সেখানেই তাদের গো-হারান হারতে হল।

সি.পি.এম. নেতারা ভাবতে বসেছে কেন এমন হল। অন্যদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে তৃণমূল ও কংগ্রেসও আহ্লাদে আটখানা, তৃণমূল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সরকারের গদিতে বসার স্বপ্নও দেখতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অগ্রণী শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের কাছে পঞ্চায়েত ফলাফলের একটাই মানে, তা হল গ্রামের তলাকার গরিব মানুষ জাগছে, তারা রুখে দাঁড়াচ্ছে। আসলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল নতুন কিছু দেখাল এমনটা নয়, ২০০৪ সালে বর্ধমানের কয়েকটি গ্রামে অন্ত্যোদয়ের চাল নিয়ে পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রামের গরিব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়া দিয়ে যার শুরু হয়েছিল এবং যারই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ এবং গ্রামবাংলা জুড়ে রেশন-বিদ্রোহ, তারই প্রতিফলন ঘটল পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

আসলে সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধে ভোট — তৃণমূলের পক্ষে ভোট নয়

তৃণমূল দল কি সত্যিই ভাবতে পেরেছিল এতগুলো পঞ্চায়েত আসন তারা জিততে পারবে ? পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এই দুটো জেলাপরিষদ "বামপন্থী"দের হাত থেকে তাদের দখলে চলে আসবে এটা কেউ ভাবেনি, সম্ভবত তার নিজেরাও ভাবেনি। যাক গে, তারা ভেবেছিল কি না নাকি ভাবেনি সে কথা থাক। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূলের বাক্সে এত ভোট পড়ল কী করে ? এই ভোট কি তৃণমূলের প্রতি সমর্থনের ভোট ? অর্থাৎ এই মানুষরা কি তৃণমূলের লোক হয়ে গেল ? এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। এটা ঠিকই যে গত দু-আড়াই বছরে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু জায়গায় সি.পি.এম. বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল তাদের সংগঠনকে বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। তাতে এমনিতেই আগেরবারের পঞ্চায়েত বা এমনকি গত বিধানসভা নির্বাচনে যে ভোট তারা পেয়েছিল তার থেকে এবারে বেশি পাওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু এটা দিয়ে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে ফলাফল হল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এখানে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যে দল পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল সেই কংগ্রেসও, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে হারলেও অন্যান্য জায়গায় ভালো ফল করেছে। আসলে আমাদের এটাই বুঝে নিতে হবে যে মানুষরা তৃণমূলকে জেতাল তাদের এক ব্যাপক অংশের ভোট তৃণমূলকে জেতানোর ভোট ছিল না, ছিল না দল হিসাবে তৃণমূলকে সমর্থন করার ভোট, সেটা ছিল সি.পি.এম.-কে হারানোর ভোট। আরও পরিষ্কার করে বললে এরা তৃণমূলকে জেতানোর জন্য সি.পি.এম.-কে হারায়নি, এরা সি.পি.এম.-কে হারাবার জন্য তৃণমূল বা কংগ্রেস ইত্যাদিদের জিতিয়েছে। এজন্যই বলছি যে, গত কয়েক বছরে গ্রামাঞ্চলে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দেখা গেছে, তলাকার মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে তার টার্গেট ছিল সি.পি.এম.। আমরা এটাও দেখেছি, বহু জায়গায় জনগণ নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করেই হোক বা না করেই হোক, নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছিল বিরোধী দলগুলোর প্রার্থীদের মধ্যে কে সি.পি.এম. প্রার্থীকে হারাতে পারবে এবং সেই প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছে, কোন পার্টিকে ভোট দিচ্ছি সেটা বিচার করেনি। যাই হোক, আমরা যে উপরের কথাটা ভুল বলিনি সেটা আপনারা আরেক দিক থেকেও বুঝতে পারবেন। সেটা হল, খুব কম হলেও কিছু জায়গায় গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরিব চাষীরা বিরোধী কোনও পার্টির কথা না ভেবে নিজেরাই মিলিত হয়ে নিজেদের স্বাধীন প্রার্থীকে দাঁড় করিয়েছে এবং অনেক জায়গায় জিতেছেও। গ্রামে এ জিনিষ অবশ্য আগে কোনওদিন ঘটেনি, এখন ঘটছে।

গ্রামীণ জনগণের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধে কেন ?

এর দুটো মূল কারণ আমরা আপনাদের কাছে রাখব। (১) প্রথম কারণটা একেবারেই মৌলিক চরিত্রের এবং সেটা অর্থনৈতিক। '৭৮ সালে সরকারে বসে "বামপন্থী"রা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছু সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছিল। বর্গা চাষীরা জমি পায়নি, তবে বর্গা আইন চালু হওয়ায় জমি থেকে উচ্ছেদ মোটের উপর বন্ধ হয়েছিল। বকেয়া কিছু খাস জমিও গরিবদের মধ্যে বিলি করা হল। পঞ্চায়েতও কিছু রিলিফের ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। বেশ কিছু যোজনা চালু হয়ে গেল। কৃষিতে উৎপাদনও কিছু বেড়ে গেল। কৃষক জনগণ বিশেষত ক্ষেতমজুর গরিব চাষীরা ভাবল এবার হয়তো সুখের মুখ দেখা যাবে। কিন্তু আট-দশ বছর যেতে না যেতেই চেহারা বদলে যেতে থাকল। ছিঁটেফোঁটা সংস্কারের কাজ যেটা নেওয়া হয়েছিল সেটা প্রায় থেমে গেল। ইতিমধ্যে সবুজ বিপ্লবের বারোটা বেজে গেল। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে নয়া অর্থনীতি চালু হওয়ার পর বিশ্বায়ন-উদারীকরণের ধাক্কা গ্রামেও পড়তে আরম্ভ করল। ক্ষেতমজুরের কাজ কমে যেতে থাকল। গ্রামীণ জনগণ যেখানে সুখের মুখ দেখবে ভেবেছিল সেখানে তাদের জীবনে নেমে এল আরও দুঃখকষ্ট। ইতিমধ্যে আরেকটা জিনিষ ঘটল। মুক্তবাজার তথা বিশ্বায়নের ধাক্কায় সব ব্যাপারে ভরতুকি ভয়ংকর কমে যাওয়ায় রেশনব্যবস্থা ভেঙে পড়ল এবং বি.পি.এল. চালু হল, সরকারি হাসপাতালে খুবই কম পয়সায় চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল। পঞ্চায়েতের রিলিফের ব্যবস্থা যেটুকু চালু ছিল সেটাও অনেকখানি শুকিয়ে গেল। পঞ্চায়েত হয়ে দাঁড়াল পার্টি নেতাদের ধান্দাবাজির ও দুর্নীতির জায়গা। এইসব মিলিয়ে গ্রামীণ জনগণের রাগ-বিক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই পড়ল, যাদের কাছ থেকে তারা অনেক প্রত্যাশা করেছিল সেই সি.পি.এম. তথা "বামপন্থী"দের উপর। জোর জবরদস্তি জমি কেড়ে নেওয়ার হামলা সেই জমতে থাকা বিক্ষোভকে ফাটিয়ে দিল।

দ্বিতীয় কারণটাও খুব বড়। সেটা হল, যে ছিল রক্ষক সেই হয়ে গেল ভক্ষক। এটা মানতেই হবে যে ১৯৭৭ পরবর্তী সময়ে, বিশেষত পঞ্চায়েতগুলিতে ক্ষমতায় যাওয়ার পর সি.পি.এম. সহ অন্যান্য "বাম"পার্টিগুলি

গ্রামের অবহেলিত তলাকার গরিব মানুষদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জায়গা করে দিয়েছিল। কংগ্রেসী আমলের জমির মালিক বাবুরা ছিল গ্রামের সব ব্যাপারে সর্বেসর্বা। গ্রামীণ ক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল এদেরই হাতে এবং এরাই ছিল কংগ্রসের মাতব্বর নেতা। এরা ক্ষেতমজুর গরিব চাষীদেরকে মানুষ বলে গণ্য করত না। তলাকার মানুষদের একমাত্র পরিচয় ছিল এরা ছোটোলোক। যাদের থাকতে হবে ভদ্রলোক বাবুদের পায়ের তলায়। নিঃসন্দেহে ১৯৭৮এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামের চেহারা বদলে গিয়েছিল। বাবুরা কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং তলাকার মানুষরাও পেল কিছুটা সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার। এককথায় তারা বাবুদের মাথায় চড়ে বসতে পেরেছিল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই গ্রামের এই নতুন চেহারা বদলে যেতে থাকল। পুরোনো বাবুরা সি.পি.এম. ও অন্যান্য "বাম"পার্টিদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল, পার্টিরাও বদলে গিয়ে খোলাখুলিভাবে বড়লোকী স্বার্থ দেখতে শুরু করে দিল। পার্টির পুরোনো নেতারাও বদলে যেতে থাকল। একসময় এসে পার্টিটাই পুরো বদলে গেল, যার প্রধান কাজই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিপতি- জমিদারদের শোষণ-শাসনকে মদত দেওয়া। ফলে যেটা হওয়ার তাই হল। গ্রামের চেহারা সেই পুরোনো জায়গায় চলে গেল। তফাৎটা হল আগে মাথায় বসে ছিল জমির মালিকরা, তাদের জায়গায় এখন বদলে যাওয়া পার্টির বদলে যাওয়া নেতারা। আর অন্যদিকে ক্ষেতমজুর গরিব চাষীরা হয়ে গেল অন্য ধরনের "ছোটোলোক" যাদের কাজ পার্টি নেতাদের কথায় ওঠবোস করা, তাদের গোলামি করে এবং ছোটখাটো একটা কাজের জন্যও তাদের পেছন পেছন দৌড়ানো। কিন্তু যে মানুষরা একসময়ে কিছুটা হলেও গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল তারা এই নয়া জলুম সহ্য করবে কেন ? সহ্যেরও একটা সীমা আছে। জনগণের জমতে থাকা সেই অসহ্য রাগ ও বিক্ষোভের একটা ঝলক আমরা দেখলাম গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। অগ্রণী শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের এটাই বুঝতে হবে যে গ্রামের তলাকার মানুষ পুরোনো অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না, শুধু তাই নয় তাদের ভেতরের চাহিদা আরও বেশি বেশি প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার। আর তাই তাদের এবারের ভোটকে শুধুমাত্র সি.পি.এম.-কে হারানোর হিসাবে দেখলে ভুল করা হবে। অন্যদিকে তৃণমূল বা সরকারি গদি দখলই যাদের লক্ষ্য এরকম সব পার্টি গ্রামীণ জনগণের এই অর্ন্তনিহিত চাহিদাকে আন্দোলনে রূপায়িত করবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই বরং তারা এই চাহিদাকে চাপা দিয়ে, নষ্ট করে পঞ্চায়েতের ঘেরাটোপের মধ্যেই আটকে রাখবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি থাকলে সেই পার্টিই একমাত্র পারত এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে।

সংগ্রামই বাঁচার একমাত্র পথ

গ্রামবাংলার ক্ষেতমজুর গরিব চাষীরা যারা একধাপ এগিয়ে এই নির্বাচনে তাদের পুরোনো পার্টি সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন তারা যদি সত্যি সত্যি সি.পি.এম.-এর কব্জা থেকে বেরিয়ে আসতে চান তবে সি.পি.এম. বা বামপন্থীদের সংস্কারবাদী রাজনীতির প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আরও পরিষ্কার করে বললে, পঞ্চায়েতের খুঁদকুড়ো নিয়ে যদি তারা বাঁচতে না চান এবং "দেখা যাক তৃণমূল কী করে" এই মিথ্যা ভরসায় থেকে আরেক জমিদারের প্রজা হয়ে থাকতে না চান, যদি চান নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই বুঝে নিতে হবে তবে ভোট দিয়ে থেমে থাকলে চলবে না, আরও এগিয়ে যেতে হবে। এই মুহূর্তে এগিয়ে যাওয়ার মানে গ্রামে/অঞ্চলে সমস্ত পার্টিদের বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলা। কে গ্রামের তলাকার মানুষদের এই কাজে সাহায্য করবে ? আগুয়ান শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা কি গ্রামীণ সাথীদের সাহায্য করবেন না ?

গোর্খা আন্দোলনকে শ্রমিকরা কী চোখে দেখবেন ?

আপনি হয়তো গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সমর্থক নন, তাকে সমর্থন করতে আপনাকে অনুরোধ-ও করছি না, কিন্তু ভেবে দেখুন ঘটনাটা — দার্জিলিং-এর ছেলে ও কলকাতা পুলিশের কর্মী প্রশান্ত তামাং টিভি-তে হিন্দি গানের বিরাট সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা "দি ইন্ডিয়ান আইডল"-এ গেলবার প্রথম স্থান দখল করেন। এফএম রেডিও-র একটা চ্যানেল তার শ্রোতাদেরকে ঐ ঘটনার খবর দিতে নাকি "রসিকতা " করে বলে —

"চোরের উপদ্রব থেকে সাবধান, কারণ চৌকিদারেরা এখন গান গাইতে শুরু করেছে"! এ ধরনের নোংরা রুচির কথার (রসিকতার) প্রতিবাদে পাহাড়-উপত্যকা উত্তাল হয়। কিন্তু কলকাতায় সে কথার কোনও ছোট-বড় প্রতিবাদের কথা শোনা গেছিল কি ? যাই হোক উত্তাল প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত এফএম-এর সেই চ্যানেলটি ক্ষমা চায়। কিন্তু ঐ ঘটনা পরিষ্কার করে দেখিয়েছিল যে পাহাড়ের জনগণকে, গোর্খাদেরকে, বঙ্গীয়/ভারতীয় এগিয়ে থাকা জাতির বাবুদের বা ভদ্রলোকেদের সমাজ কী চোখে দেখে। গোর্খা বা সাধারণ নেপালী মেহনতী জনগণ হল, বাবুদের চোখে, নিছকই চৌকিদার-দারোয়ান মাত্র, খুবজোর বিশ্বস্ত-প্রভুভক্ত ভৃত্য বা সাহসী-অনুগত সিপাহী। আপনি যদি একজন শ্রমিক হন, আপনার সহকর্মীদের মধ্যে যদি বিহারী, ওড়িয়া, নেপালী শ্রমিক থাকে, তবে ভেবে দেখুন — ও রকম জাতি তুলে অপমানকর কথাতে মাথায় আগুন জ্বলে যায় না ? বাঙালী শ্রমিকরা এটা কতটা বুঝতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, জাতি হিসেবে বাঙালী জাতি ভারতের উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিশেষ করে বিহারী শ্রমিকরা এই জাতিগত অপমানের ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। তারা সারা দেশেই এ ধরনের অপমানের মুখে পড়েন। বাঙালী বা অন্যান্য উন্নত জাতির বাবুদের চোখে বিহারী মানেই হল যাদের বুদ্ধি কম, শিক্ষাদীক্ষা কম, যারা কালচারে (সাংস্কৃতিক ভাবে) পেছিয়ে থাকা... ইত্যাদি। তেমনি নেপালী মানেই পুরোনো বাংলা গল্পে বা সিনেমায় সাধারণভাবে কোনও "বাহাদুর" বা সে রকম নামের চৌকিদার বা দারোয়ান বা পাহাড়ি এলাকার ড্রাইভার চরিত্র থাকে। এখানে অর্থনৈতিক ধরনের শোষণ বঞ্চনার কথা যদি বাদ-ও দেন তাহলেও যেটা লক্ষ্য করার মতো ও যেটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা দেয় সেটাকে বলে জাতিগত অপমান, নির্যাতন, বঞ্চনা। আর এই জাতিগত অপমান, নির্যাতন, বঞ্চনার জায়গাটা আছে বলেই না ঐ একটা মন্তব্যে গোটা পাহাড় যেন এক হয়ে উদ্বেলিত হল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়ল। না হলে, এ সবকে স্রেফ বিমল গুরুং-দের চক্রান্ত বা উস্কানি বললে, কি সবটা যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়! কিন্তু বিষয়টা স্রেফ সেটুকুই নয় যে গোর্খাদেরকে কী চোখে বাবুরা দেখে। বরং আরও যা মারাত্মক সেটা হল গোর্খাদেরকে অর্থনৈতিক-সামাজিক দিক থেকে এরকম অবস্থাতেই বরাবর রাখা হয়েছিল। এমন জায়গায় রাখা হয়েছিল যাতে গোর্খা জনগণ স্রেফ বিশ্বস্ত–প্রভুভক্ত চৌকিদার-দারোয়ান ... বা পাহাড়ে ওঠার জন্য দরকারি কুলি হতে পারে। যাতে খুব জোর তারা সাহসী সিপাহী ইত্যাদির যোগান দিতে পারে, ব্যাস এটুকুই। ভেবে দেখুন, শ্রমিকশ্রেণী, যে কি না সব ধরনের অসাম্য, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সে কী এসব জাতিগত অপমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে না ? গোর্খা মেহনতী জনগণের ওপর শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না ?

আপনাকে আদৌ গোর্খাল্যান্ড-এর দাবি সমর্থন করতে হবে না, কিন্তু তাদের দাবির পেছনের যৌক্তিকতা আছে কিনা দেখুন! সাধারণভাবে নেপালী ভাষায় যারাই কথা বলেন, তাদের সবাইকেই নেপালী, অর্থাৎ কিনা তারা নেপালের লোক, সেইজন্য তারা ভারতীয় নয়, তারা বিদেশী — এভাবে ভাবেন অনেকে। ঐ তো ক'দিন আগেই এক মন্ত্রীমশাই দার্জিলিং-এর গোর্খাদেরকে বিদেশী বলে দিলেন। আর তার সাথে যুক্ত করুন আরেকটা কথা — পশ্চিমবঙ্গকে আর ভাগ হতে দেব না। যেটার মানে হল — দার্জিলিং-টা হল পশ্চিমবঙ্গের হর্তাকর্তা হোমড়াচোমড়াদের নিজেদের খাস জমিদারি — কারণ তারা ছাড়া আপনার মতো শ্রমিক বা গ্রামের চাষী লেবারদের তো সেখানে যাওয়ার মতো টাকাকড়ি নেই — সেখানে বিদেশী গোর্খাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, চাকরি করতে দেওয়া হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট; সেটাকে আবার ভাগ করে গোর্খাদের জন্য রাজ্য চাওয়া হচ্ছে — মাজাকি নাকি — ওসব আরেকটা রাজ্য-টাজ্য চাওয়া চলবে না। এটা হল বাঙালী জমিদারবাবুদের মতো কথা, যারা মনে করে যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে তারা বৃটিশ রাজত্ব থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, এটা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। দার্জিলিং হল বাবুদের বেড়াতে যাওয়ার জায়গা, সিনেমার শুটিং করার জায়গা। **আসলে কিন্তু মাত্র দেড়শো বছর আগে পর্যন্ত দার্জিলিং বাঙলার বা তখনকার অবিভক্ত বাঙলার অংশই ছিল না — ইতিহাসে তার আগে কখনই দার্জিলিং বাঙলার অংশ ছিল না — সিকিমের রাজাদের কাছ থেকে বৃটিশরা দার্জিলিং বলে পরিচিত অঞ্চলটাকে উপহার হিসেবে পেয়েছিল প্রায় শ'দেড়েক বছর আগে।** কি বৃটিশ সাহেবরা কি বাঙালী বাবুরা — কেউই কোনওদিন জানতে চায়নি সেখানকার অধিবাসীরা কী বলে, তাদের কী-ই বা মতামত। এর সাথে আরেকটা সমস্যা যোগ করুন — যখন গোর্খাদেরকে নেপালী, বিদেশী লেবেল মেরে অন্য কোনও প্রদেশ থেকে তাড়ানো হয়েছে, তখন তারা প্রতিবাদ করার সেই জোরটা পায়নি, পায়-ও না। ঐ তাড়ানোর ঘটনা কিন্তু অতীতে হয়েছে। আর এখন তো রাজ্যের এক মন্ত্রীমশাই বলছেন

গোর্খারা বিদেশী। আর এই বিদেশী ছাপ মারার অনিশ্চয়তাবোধ কিন্তু গোর্খাদেরকে খুবই পীড়িত করে — তাদের বেশিরভাগই তো শ্রমিক, এবং দার্জিলিং-এ কাজের সুযোগ কম থাকায় তাদের অনেককেই বাইরে বাইরে কাজ করতে যেতে হয়। তো সেই অনিশ্চয়তাবোধের থেকে তাদের মুক্তির পথ কী — সেটা নিয়ে না ভেবে, তা নিয়ে কিছু না করে, স্রেফ "বাঙলাকে আর ভাগ করতে দেব না" বলে চেঁচালে, হম্বিতম্বি করলে, নিজেদের শক্তি-ক্ষমতা জাহির করলে তার মানেটা কী দাঁড়ায় বলুন তো গোর্খাদের কাছে ? গোর্খাদের সমস্যাগুলো সহানুভুতি নিয়ে না দেখে এই উলটো জবরদস্তির মনোভাব দেখানোর অর্থ দাঁড়ায় বাঙালী বৃহৎ জাতিসুলভ উগ্র জাতীয়তাবাদকেই সমর্থন করা।

সি পি এম-রা, অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের পার্টিরা, বাঙলা প্রচারমাধ্যম ইত্যাদিরা সহ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি বাঙালীরা যত বেশি করে **উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের** পক্ষ নেবে ততই বেশি করে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভালোরকম ভাবে সংখ্যালঘু গোর্খারা **গোর্খা জাতীয়তাবাদের** পক্ষ নেবে। এবং তাতে দু'তরফের মেহনতীরাও শিকার হবে — শেষ পর্যন্ত দু'তরফের শ্রমিক সহ মেহনতীদের মধ্যে দূরত্ব বাড়বে। তাতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ক্ষতিই হবে। এবং শ্রমিকশ্রেণী গোর্খাল্যান্ড নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কথাটাও পৌঁছতে পারবে না শ্রমিক সহ মেহনতী গোর্খাদের কাছে। **মেহনতী গোর্খারা বাঙালী শ্রমিকদেরকে নিছকই বাঙালী হিসেবে দেখবে — শ্রমিকশ্রেণীরই অংশ হিসেবে, সহযোদ্ধা হিসেবে দেখবে না — ফলে তাদের কথাকে শোনার বোঝার কোনও উৎসাহ বা চেষ্টা করবে না।** অথচ, শ্রমিকশ্রেণীর বক্তব্যটা সেখানে পৌঁছনো দরকার, এবং সে সব বাঙালী শ্রমিকদের কাছেও পৌঁছনো দরকার যারা বাঙালী মালিকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন আপনি বাঙালী জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন নন, আপনি সব রকমের বড়-জাতিসুলভ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী, তবেই তো আপনার বক্তব্যটা শোনার মতো আগ্রহ তৈরি হবে। কী সেই কথা ? কথাটা হল — গোর্খাদের ঐ আন্দোলনের পেছনে বাস্তব কারণ অবশ্যই আছে। এবং সে দাবি গোর্খারা করতেই পারেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কয়েকটা ভাবার বিষয় আছে। ভারতের নানা বড়-ছোটো জাতি আছে, যাদের নিজেদের জাতির আলাদা আলাদা রাজ্য আছে। বা প্রথমে না থাকলেও পরে হয়েছে। সেখানেও কিন্তু, একদিকে যেমন নিজের ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করা, নিজের সংস্কৃতির বিকাশ সহ নানা কিছুই সে রকমভাবে হয়নি। আর অন্যদিকে, শ্রমিক-কৃষক সহ মেহনতীদের জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রেও কোনও রকম লাভ হয়নি। যেমন ধরুন — ঝাড়খণ্ড। চিন্তা করুন — এমনকি অসমে নির্যাতিত সাঁওতালদের পাশে কি সত্যি করে দাঁড়াতে পেরেছে ঝাড়খণ্ড সরকার ? এমনকি যাদের ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি অনেক উন্নত, যাদের আলাদা রাজ্য আছে, তারাও কিন্তু ভারতবর্ষের জাতিগত বৈষম্য নিয়ে বারবার সরব হয়েছে, লড়াই করেছে ইত্যাদি — যেমন তামিলরা। রাজ্য পেয়েও সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের সমস্যা কতদূর মিটেছে ? বা কাউন্সিল পেয়ে বোরোদের সমস্যা কতদূর মিটেছে ? যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রাজ্যগুলো বাঁধা, যে নিয়মকানুন ও আইন মেনে চলতে হয় ওসব রাজ্যকে, সব স্বায়ত্ত্বশাসিত কাউন্সিলকে (যেমন বোরোল্যান্ড ইত্যাদি), তাতে করে ওসবগুলোকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী ব্যবস্থা-নিয়ম মেনেই চলতে হয়। অসমের দিকে তাকান। অসমের চা-বাগান শ্রমিকদের অবস্থা কেমন ভেবে দেখুন। উপরন্তু চালু কাঠামোর মধ্যে জাতিগত আন্দোলনের নেতাদেরকে নানান সুযোগসুবিধার ও দুর্নীতির সুযোগ করে দেওয়া থাকে। অর্থাৎ সেই জাতির উপরের দিককার একটা অংশকে ঐ চালু মালিকরাজের শাসনের কিছু ছোটখাটো ভাগ বা শেয়ার দেওয়া হয়। ফলে, জাতিগত আন্দোলন নিয়ে চুক্তি করে মিটমাট হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় — যেসব পুরোনো নেতারা আগে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা আর জনগণের চোখে বিশ্বাসযোগ্য থাকছেন না। বরং নতুন কিছু নেতা আরও জঙ্গি লড়াইএর কর্মসূচী নিয়ে সামনে চলে আসছেন। তারপর, ক্ষমতা পেয়ে নানা সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা তৈরি হয়। অসমে বোরো বনাম সাঁওতাল দ্বন্দ্ব তৈরি কীভাবে হল ভাবুন। ফলে, এই চালু রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে গোর্খারা যদি একটা আলাদা রাজ্য হিসেবে গোর্খাল্যান্ড পেয়েও যান তাহলেও জাতি হিসেবে গোর্খাদের অতি সামান্য কিছু লাভ হবে কিনা তা বলা যায়না, তবে শ্রমিক বা মেহনতী হিসেবে গোর্খাদের খুব একটা লাভ নেই — বরং গোর্খা জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে থাকা অংশ তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে, শাসন (ও শোষণ) ক্ষমতার একটা ছোট্ট ভাগ পাবে — মাঝখান থেকে মেহনতী গোর্খারা তাদের নিজেদের জাতির এগিয়ে থাকা অংশের দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবেন।

তাহলে উপায় কী ? উপায় একটাই। যদি সাম্রাজ্যবাদ ও তার হাত ধরে চলা দেশের বড় মালিকশ্রেণীকে দেশের শাসনক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক-কৃষকের রাজত্ব কায়েম করা যায়, তবে সেই রাজত্বই সত্যিকারের জাতিসমস্যার সমাধান করতে পারবে — কারণ শ্রমিক-কৃষক সবার সমান অধিকার বা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর ঐ সমস্যাটা গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ছে কেন ?

— সুকুমার রায়

গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে গত এক বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আগের সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বিপুলভাবে বেড়ে চলেছে। জুন মাসে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১৪০ ডলার ছুঁয়ে ফেলেছে (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিশেষজ্ঞরা এই দাম ব্যারেল পিছু ২০০ ডলারে পৌঁছে যাবার আভাস দিচ্ছেন। তারা সবাই ১৯৭৯ সালের "তেল সঙ্কট"এর থেকেও ভয়াবহ এক সঙ্কটের আশঙ্কা করছেন। ১৯৭৯র সঙ্কটে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো সহ ভারতের অর্থনীতি টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল। ভারত তার সঙ্কট মেটানোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার করেছিল আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদির কাছ থেকে। সেই ধার মেটাতে গিয়ে ভারতকে গিলতে হয়েছিল কড়া কড়া শর্তাবলী যার ফল ভোগ করতে হয়েছিল ভারতের গরিব মেহনতী জনগণকেই। এবার তার থেকেও না কি খারাপ ধরনের সঙ্কট আসছে!

বিশ্ববাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির গতিবেগ দেখলে সত্যি চোখ কপালে উঠে যায়! যেমন, ১৯৯৮ সালে — অর্থাৎ আজ থেকে ১০ বছর আগে — তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু মাত্র ১১ ডলার। আর আজ সেটা দাঁড়িয়েছে ১৪০ ডলারে! দাম বেড়েছে **১৩ গুণের** কাছাকাছি! শতকরা হিসেবে **১১৭৩%!** মাত্র ১ বছর আগে, অর্থাৎ ২০০৭ সালের শেষার্ধে এই দাম ছিল ৬৫ ডলারে। আর এখন, ২০০৮এর জুনে তা **দ্বিগুণেরও বেশি (১১৬%)** বেড়ে গেল! সত্যি এসব হচ্ছেটা কী ? কারা বাড়াচ্ছে এই দাম ? কেন বাড়াচ্ছে ? তারা কি পাগল হয়ে গেছে ?

এটা অনেকেই জানেন যে, বিশ্বের বড় বড় তেল উৎপাদক দেশগুলি হল সৌদি আরব, কুয়েত, ইরান, ভেনেজুয়েলা, ইত্যাদি "ওপেক" গোষ্ঠীভুক্ত দেশ। এছাড়া আমেরিকা, রাশিয়ার মতো উন্নত দেশগুলিও যথেষ্ট তেল উৎপাদন করে। তবে বিশ্ববাজারে তেলের ব্যবসার (অর্থাৎ, আমদানি-রপ্তানি) সিংহভাগ-ই আসে ঐ "ওপেক"ভুক্ত দেশগুলি থেকেই। তবে কি এই "ওপেক" দেশগুলি নিজেদের মধ্যে শলা করে তেলের দাম হু হু করে বাড়িয়ে চলেছে ? বছর পাঁচেক আগেও "ওপেক" দেশগুলি তাদের অতি মুনাফার তাগিদে মাঝেমধ্যেই দাম বাড়াত। কিন্তু এবার বড় বড় বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিতরা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তেলের বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির পেছনে "ওপেক" নেই। আছে এমন কিছু সংস্থা যাদের সঙ্গে তেলের উৎপাদন ও ব্যবসার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এরা হল ফাটকাবাজ কিছু সংস্থা যাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমাহীন বললেও কম বলা হবে।

ফাটকাবাজির নতুন মোড়ক, নতুন কায়দা

ফাটকাবাজি কথাটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। যেমন, বড়লোকেরা সোনা কিনে সিন্দুকে জমিয়ে রাখে সোনার দাম কখনও বেড়ে গেলে সোনা বেচে মুনাফা লুটবে বলে। শেয়ার বাজারে কোম্পানীর শেয়ার কিনে তা ধরে রেখে সুযোগ বুঝে বেশি দামে বেচে মুনাফা লোটাও এক ধরনের ফাটকা। মজুতদাররাও এক ধরনের ফাটকাবাজ। এরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন: চাল-ডাল-চিনি-গম-ভোজ্যতেল ইত্যাদি মজুত করে রাখে ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায়। আজকাল বড়লোকরা জমি-বাড়ি-সম্পত্তি কিনে রাখছে — ভবিষ্যতে দাম বাড়লে বেচে দিয়ে মোটা লাভ করার আশায়। এই ফাটকাবাজি (যা আসলে এক ধরনের জুয়া-জোচ্চুরি) এখন আরও অনেক বিস্তৃত বিকশিত হয়ে উঠেছে; বা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আধুনিক ও দানবীয়।

যেমন, এখন অধিকাংশ ফাটকাবাজি আর সরাসরি দ্রব্য বা পণ্য বিনিময়ের (বা কেনাবেচার) মধ্যে দিয়ে হয় না। এখন তা হয় কাগজে-কলমে এবং কমপিউটারের বোতাম টিপে। ধরা যাক, এই জুন মাসে ব্যারেল পিছু তেলের দাম ১৪০ ডলার। কোনও ফাটকাবাজ আগামী ডিসেম্বরে তেলের দাম ১৬০ ডলারে চড়ে যাবে এই

অনুমানে (বা, আশায়) ডিসেম্বরের তেলটা (ধরা যাক ১০০ ব্যারেল) এখনই **আগাম** কিনে রাখল। খেয়াল রাখবেন, সে তেলটা কিনল কাগজে-কলমে। ছয় মাস বাদে ডিসেম্বরে তেলের দাম ১৬০ ডলারে না-পৌঁছালে তার লোকসান। আর, ১৬০ ডলার বা তার বেশি দামে পৌঁছালে তার মুনাফা।

অর্থাৎ তার লাভ বা লোকসান দুটোই হতে পারে। ছোটখাটো ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী হলে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিনিয়োগকারী সংস্থার আর্থিক ক্ষমতা বিশাল হলে মুনাফার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন, ঐ সংস্থা যদি মোটে ১০০ ব্যারেলের বদলে ১ কোটি ব্যারেল তেল (কাগজে-কলমে) **আগাম** কিনে রাখে, তাহলে তেলের বাজারে বেশ চাঞ্চল্য বা হই চই পড়ে যাবে। আরও অনেক ছোট-বড় সংস্থা দ্রুত মুনাফার জন্য একই কারবারে নেমে পড়বে। কেউ কেউ হয়তো আরও বেশি দামে আরও বেশি তেল আগাম কিনে রাখবে! এই "**আগাম ব্যবসা**"তে (ইংরাজিতে "ফিউচার ট্রেডিং") যে পরিমাণ ডলার বিনিয়োগ হয় তার পরিমাণ কল্পনাতেও আনা যায় না। যেমন, ২০০5 সালে শুধু তেলের "আগাম ব্যবসা"তে বিনিয়োগ হয়েছিল ১,৭০,০০০ কোটি ডলার। ২০০৭ সালে এই বিনিয়োগ অবিশ্বাস্য মাত্রায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮,০০,০০০ কোটি ডলার (**৩৭০%-**এরও বেশি)!! ২০০৭ সালের এই ফাটকা-বিনিয়োগ ভারতের ২০০৬-০৭ সালের মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP)-এর থেকে **৫৯ গুণ** বেশি ছিল!! যারা তেলের এই "আগাম ব্যবসা" করে চলেছে তাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ কতটা বিপুল তা এই হিসেব থেকেই বোঝা যায়। এদের আর্থিক পুঁজির এতটাই ক্ষমতা যে কাগজে-কলমে লক্ষ লক্ষ ব্যারেল তেল কিনে আগামী ছয় মাস পরে তেলের দাম কতটা হবে সেটাও তারা ঠিক করে দিতে পারে! এভাবে এরা ২০০৯-১০ সালের দামটাও বোধহয় এখনই ঠিক করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে!

মহা দৈত্যাকার এই (মার্কিন) আর্থিক সংস্থাগুলি হল: গোল্ডম্যান স্যাক্স, মরগ্যান স্ট্যানলি, সিটি গ্রুপ, জেপি মরগ্যান চেজ্, ইত্যাদি। ২০০৬ সালে বিশ্ববাজারে যখন তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু ৬০ ডলার, তখন মার্কিন প্রশাসনের নিযুক্ত এক কমিটি তদন্ত করে জানায় যে তেলের দাম হওয়া উচিত মাত্র ২৫ ডলার। অর্থাৎ ক্রেতাদের ব্যারেল পিছু দ্বিগুণেরও বেশি খসাতে হয়েছিল ঐ সব ফাটকাবাজ রাঘববোয়ালদের পেট ভরানোর জন্য! এবারেও বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, ফাটকা না-হলে এই মুহূর্তে তেলের দাম অন্তত "৬০ শতাংশ কম" অথবা, ৫৬ ডলারে নেমে যেত। অবস্থাটা এমন জায়গাতে চলে গেছে যে, তেল উৎপাদক "ওপেক" দেশগুলোর হাতে এখন না কি তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের প্রায় কোনও ক্ষমতাই নেই। বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল উৎপাদক দেশ ও আমেরিকার ঘনিষ্ঠ তাঁবেদার সৌদি আরব ও কুয়েতের শাসকরা এ ব্যাপারে তাদের অসহায়ত্ব খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে। এমনকি কারও কারও মতে খোদ আমেরিকারও ক্ষমতা নেই এই আর্থিক পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করে তেলের দামে লাগাম পড়ানো! তেলের দর ঠিক করার চাবিকাঠি এখন এই ফাটকা পুঁজিরই হাতে!

ডলারের পড়তি দাম ও তেলের মূল্যবৃদ্ধি

বিশেষজ্ঞদের মতে ফাটকা না-থাকলে বিশ্ববাজারে এখন তেলের দাম থাকত ৫৬ ডলারে। কিন্তু এই অঙ্কও তো কম নয়! ১৯৯৮ সালের বিচারে তা সাড়ে ৭ গুণেরও বেশি! সেটাই বা হয় কী করে ?

বিশ্ববাজারে তেল কেনাবেচার অধিকাংশটাই হয় মার্কিন ডলারে এবং আমেরিকাই বিশ্ববাজারে তেলের সবচেয়ে বড় খদ্দের। কিন্তু, মার্কিন ডলারের দাম বেশ কয়েক বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের "ইউরো" এবং জাপানের "ইয়েন"এর থেকে নেমে চলেছে। অর্থাৎ, আজ ১ ডলারে যে পরিমাণ তেল পাওয়া যায়, কাল ডলারের দাম কমে গেলে ১ ডলারে তেলও মিলবে কম। অন্যভাবে বললে, আমেরিকাকে তার তেল খরচের মাত্রা বজায় রাখতে গেলে আরও বেশি ডলার খরচ করতে হবে। কিন্তু মার্কিন ডলারের এই দাম পড়ে যাওয়া আটকানোর কোনও দাওয়াই আপাতত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার, ডলারের দাম এভাবে পড়তে থাকলে মার্কিন কোম্পানী সহ আরও বহুজাতিক সংস্থার ক্ষতি হতে থাকবে। তাই মার্কিন এই কোম্পানীগুলি সহ আর্থিক সংস্থা মর্গান স্ট্যানলি, গোল্ডম্যান স্যাক্স-রা তাদের পাহাড়প্রমাণ মুনাফা বজায় রাখার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। তেলের ফাটকাবাজি করে তারা ডলারের দাম পড়ে যাওয়ার ক্ষতি উসুল করে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেমন, ডিসেম্বরে তারা যাতে ব্যারেল পিছু ১৬০-১৮০, এমনকি ২০০ ডলারও পেতে পারে, তার ব্যবস্থা তারা তেলের ফাটকাবাজির মাধ্যমে নিশ্চিত করে রাখছে—তখন ডলারের দাম আরও পড়ে গেলেও মুনাফার মাত্রাটা যেন ঠিকঠাক থাকে।

তেলের চাহিদা ও জোগান

বাজারে জোগানের থেকে চাহিদা বেশি থাকলেও জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। যেমন, বেশি বৃষ্টির ফলে সবজি চাষ মার খেলে বাজারে সবজির জোগান কমে। ফলে দামও বাড়ে। একই নিয়ম তেলের ক্ষেত্রেও খাটে। পৃথিবীতে তেলের ভাঁড়ার যে অসীম নয় তা সবাই জানে। কিন্তু তাতে তেলের খরচে কোনও কমতি পড়া দূরে থাক, তেলের ব্যবহার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানের মতো ধনী রাষ্ট্রগুলি ও তাদের বড়লোকেরা অবিশ্বাস্য পরিমাণে তেলের ব্যবহার বাড়িয়ে চলেছে। যেমন, আমেরিকার মাথাপিছু তেল ব্যবহার ভারতের থেকে ২৫ গুণ, চীনের থেকে ১৯ গুণ বেশি! আমেরিকার তেল-ব্যবহারের ৭০%-ই যায় পরিবহণ খাতে বা ধনীদের ব্যক্তিগত গাড়ির ট্যাঙ্ক ভরতে। তবে, ভারত-চীনের তেল ব্যবহারও বাড়ছে বেশ ভালো গতিতেই। পুঁজিবাদী সংস্কারের ফলে যে নতুন নতুন ধনী তৈরি হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত গাড়ির ট্যাঙ্ক পূর্ণ করতে এখন ভারত-চীনও বড় আকারে তেল ব্যবহার বাড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু বিশ্বে তেলের উৎপাদন খুব একটা বাড়ছে না। নতুন তেলের খনির খোঁজও খুব একটা মিলছে না। ফলে তেলের জোগান ও চাহিদার মধ্যে বেশ টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। এর ফলেও তেলের দাম বাড়ছে। ফাটকাবাজি না-থাকলেও বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ত। পুঁজিবাদী সমাজের ধনী-বড়লোকদের ব্যক্তিগত স্ফূর্তি-আমোদ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য তেল ব্যবহারও বাড়বে, দামও বেড়ে চলবে।

কারা লাভ করছে ?

মোটা পেট আরও মোটা হচ্ছে গোল্ডম্যান স্যাকস্, মরগ্যান স্ট্যানলি, ইত্যাদি দানবীয় আর্থিক সংস্থাগুলির। এই আর্থিক সংস্থাগুলির সঙ্গে আবার মাকড়সার জালের মতো গাঁথা রয়েছে সারা দুনিয়ার বড়-ছোট-খুদে বিনিয়োগকারী। এমনকি ভারতের মতো পিছিয়ে থাকা দেশের হরেক রকমের বিনিয়োগকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গও এদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে পকেট ভরছে।

আর লাভবান হচ্ছে বিশ্বের বড় বড় মার্কিন-ব্রিটিশ তেল কোম্পানী। এই তেল কোম্পানীগুলোর মুনাফার মাত্রা ও ক্ষমতা চিরকালই আকাশছোঁয়া। আর এখনকার ফাটকা ও তেলের মূল্যবৃদ্ধির সুবাদে এদের মুনাফা নতুন নতুন রেকর্ড করে ফেলছে। ২০০৬ সালে মার্কিন তেল কোম্পানী এক্সন-মোবিল মুনাফা করেছে ৩৯৫০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা) যা এখনও পর্যন্ত কোনও মার্কিন কোম্পানী জীবনে করেনি!

দাম বাড়লে মুনাফার হার বাড়বে, পরিমাণ বাড়বে — এতে আর আশ্চর্যের কী ? কিন্তু বিশ্ববাজারে তেলের ব্যবসাকে নিয়ে যেসব খেলা চলছে তাতে আবারও নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে যে পুঁজিবাদ এখন নক্কারজনক জুয়া-জোচ্চুরি-ফাটকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পুঁজিবাদকে গরিব মেহনতী মানুষের বুকের ওপর থেকে উপড়ে না ফেললে মুক্তি নেই।

মার্কসবাদের মৌল পাঠক্রম

রাষ্ট্র কী এবং কেন (১)

– হেনরী বিশ্বাস

[এই লেখাটি এর আগে দু' কিস্তিতে "শ্রমিক ইস্তাহার"-এর জুন, ২০০৪ এবং জুলাই, ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় লেখাটি আগুয়ান শ্রমিকদের বেশ আকৃষ্ট করেছিল। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচার করে আমরা লেখাটিকে আবার পুনর্মুদ্রণ করছি। আগের বারের মতোই এবারেও আমরা লেখাটি ভেঙে ভেঙে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, যে সময় "শ্রমিক ইস্তাহার"-এ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক তার আগে আগেই লোকসভা নির্বাচন হয়েছে এবং বি জে পি পরিচালিত এন ডি এ জোটকে হারিয়ে সদ্য সদ্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। লেখাটিতে এই নির্বাচন ও সেই সময়কার আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু লেখক ২০০৫ সালে মারা গেছেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা লেখাটি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থাতেই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। — **সম্পাদকমণ্ডলী, "শ্রমিক ইস্তাহার"**]

এবারকার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে উত্তেজনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বাজারি কাগজপত্রগুলিতে এই নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে নানারকম কাটাছেঁড়া এখন জোরকদমে চলছে। তো, সেই সব আলাপ-আলোচনা চলছে চলুক। এই লেখাটিতে আমরা সেই সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। তবে, এই নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনের সময় শেয়ারবাজারের সূচকের হঠাৎ পড়ে যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলিতে যে প্রবল হইচই চলেছিল এবং সেই সময়ের তুলনায় কম মাত্রায় হলেও এখন চলছে সেই ঘটনাটিকে নিয়েই আমরা এই আলোচনাটি শুরু করব।

ব্যাপক বিলগ্নিকরণ, বেসরকারিকরণ ইত্যাদির ভেতর অর্থনৈতিক উদারীকরণের যে নীতি আগেকার বি.জে.পি.-র নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার জোরদারভাবে প্রয়োগ করে চলেছিল, তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের অসন্তোষ, ক্রোধ ও বিক্ষোভই এবারকার নির্বাচনী ফলাফলের ভেতর দিয়ে ধরা পড়েছে — এইরকম একটা বিশ্লেষণ নির্বাচনী ফলাফল বের হবার পর পর থেকেই অনেকে করতে শুরু করেছিলেন এবং এখনও করছেন। বাজারি পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন লেখাগুলির ভেতর থেকে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত কম-বেশি স্পষ্টভাবেই বেরিয়ে এসেছে এবং নির্বাচনে জয়ী শিবিরের প্রায় সবাই, বিশেষ করে সিপিআই(এম), সিপিআই ইত্যাদি তথাকথিত বাম দলগুলি জোরের সাথে এই কথা জানাচ্ছিল। সুতরাং "বাম" দলগুলির সমর্থনপুষ্ট নতুন কংগ্রেসী জোটের সরকার আগেকার বি.জে.পি. জোটের সরকারের মতন অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করে চলবে না, বিলগ্নিকরণ বেসরকারিকরণের গতির ওপর বেশ কিছুটা রাশ টেনে চলবে এবং আগেকার সরকারের তৈরি বিলগ্নিকরণের আলাদা মন্ত্রক তুলে দেওয়া হবে — এই কথা কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ থেকে আরম্ভ করে সিপিআই(এম)-এর সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই-এর বর্ধন সবাই জানাচ্ছিলেন। এই সব কথা বলা শুরু হওয়া মাত্র ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্য মহলে পড়ে গেল তুমুল শোরগোল। মুম্বাই-এর শেয়ারবাজারের সূচক একদিনে এত নিচে নেমে গেল যা নাকি একটা রেকর্ড। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পত্র-পত্রিকাগুলিতে শুরু হল "গেল গেল রব"। এরা সবাই সিপিআই(এম) ইত্যাদি "বাম"দলগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে থাকল যে "এরাই নষ্টের গোড়া — আজেবাজে কথা বলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য মহলে আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে — তাই শেয়ারবাজারের এইরকম দশা হয়েছে — দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজতে চেলেছে।" যদিও শেয়ারের সূচক হু-হু করে নেমে গেলে দেশের কেন বারোটা বাজবে এবং এই দেশের শ্রমিক-কৃষকের জীবনে এক বিরাট ক্ষতি হবে — তা কিন্তু কেউই ব্যাখ্যা করলেন না। বরং আমরা দেখেছি, আগের বি.জে.পি. সরকারের আমলে শেয়ারবাজারের সূচক এমন বেড়ে গিয়েছিল যা নাকি আবার একটি রেকর্ড — অথচ তাতে ভারতের জনজীবনের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি, বরং তাদের জীবনের দুর্ভোগ বেড়ে যাওয়াতে, তারা রেগে গিয়ে সেই সরকারের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, প্রচারমাধ্যমগুলি যেই এই গেল গেল রব তুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে সিপিআই(এম) পর্যন্ত সবাই ভয় পেয়ে গেল। তারা সবাই এই কথা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তারা মোটেই অর্থনীতির উদারীকরণের নীতির বিরুদ্ধে নয় — নতুন সরকার এই উদারীকরণের নীতিতেই চলবে। এবং তারা এই কথা জানাতেও ভুল করলেন না যে তারা কখনই অর্থনীতির উদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেননি — নীতির প্রয়োগের গতিকে অল্প পরিমাণে কমানোর কথাই বলেছেন। ব্যাপারটা সত্যিই তাই। বিলগ্নিকরণ, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি পুরোপুরি বাদ দেওয়ার কথা এরা কেউই বলেননি। লাভজনক রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণ, বেসরকারিকরণের নীতি প্রয়োগ করা হবে না, শ্রমিক ছাঁটাই যতটা কম করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবেন ইত্যাদি কয়েকটা কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু তাতেই দেখা গেল, এই দেশের শিল্প বাণিজ্য মহলের রাঘববোয়ালরা চটে লাল হয়ে গেল, বাজারি পত্র-পত্রিকাগুলি গেল গেল রব তুলে দিল এবং মনমোহন সিংহ থেকে সীতারাম ইয়েচুরি পর্যন্ত সবাই এই কথা বোঝানোর জন্য হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন যে তারা মোটেই অর্থনীতির উদারীকরণের নীতির বিরুদ্ধে নয় — নতুন সরকার এই নীতির পথ ধরেই চলবে।

ব্যাপারটা কী রকম গোলমেলে দেখুন। নির্বাচনে জিতে যারা নতুন সরকার গঠন করেছে তারা প্রায় সবাই এই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে যে আগেকার বি.জে.পি. সরকারের অর্থনীতির উদারীকরণের নীতির বিরুদ্ধেই ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ এই নির্বাচনে রায় দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে সত্যি বটে। তার মানে, জনগণের এই রায় মেনে নিলে (এবং যা এই দলগুলির অবশ্যই মানার কথা) নতুন সরকারকে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতির বিরুদ্ধে যাওয়াই উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পরিবর্তনের

কথা বলা মাত্র যেই এই দেশের শিল্পপতি মহল হইচই পাকালেন সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন সরকারের ভেতরকার শরিক ও বাইরের সমর্থকরা "আরে ছিঃ ছিঃ, কেন এত ভুল বোঝেন" — এই কথা শিল্পপতিদের ভালো করে বোঝানোর জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। শিল্প-বাণিজ্য মহলকে এই কথা আরও ভালো করে বোঝানোর জন্য নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম তো এখন শিল্পপতিদের সংস্থাগুলির দ্বারে দ্বারে হাজির হচ্ছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষক সহ ব্যাপক জনগণ তাদের ভোটের ভেতর দিয়ে যাই বোঝাক, তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা বা দাবিগুলিকে পূরণ করার চেষ্টা করা কিংবা পাত্তা দেওয়ার ওপর সরকারের টিকে থাকার ব্যাপারটা নির্ভর করছে না। বরং ভারতবর্ষের জনসংখ্যার খুবই সামান্য অংশ — শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের রাঘব বোয়ালরা কী চাইছে, তা বোঝা এবং তাদের সেই দাবিগুলিকে মেনে নেওয়ার ওপরই এই দেশের সরকারের টিকে থাকার ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে। তাই অর্থনীতির উদারীকরণের নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথা জানানো মাত্র শেয়ারবাজারে গণ্ডগোল পাকিয়ে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা তাদের অপছন্দটা জানিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকারের শরিক ও সমর্থকরা শিল্প-বাণিজ্য মহলের আশঙ্কা দূর করার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল, তাদের রাগ ভাঙাবার জন্য তাদের বাড়ির দরজায় হাজির হয়ে গেল।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি সত্যি কি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে না ? সেই সত্যিগুলি হচ্ছে —

ক) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই সব ক্ষমতা, এই সরকারই দেশের শাসক — ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়।

খ) জনগণের ভোটে এই সরকার গঠিত হয়েছে, অতএব এই সরকার জনগণেরই সরকার। জনগণ যে রকম চাইবে সরকারকে সেই রকমই চলতে হবে — এই যে কথা বলা হয় এটি, একটি মিথ্যা প্রচার।

গ) এই দেশের আসল শাসক এক দল আছে — যারাই আসলে সরকারকে চালায়। তারা যে রকম চাইবে, এই দেশের যে কোনও সরকারকে সেই রকমই চলতে হবে। কোনও সরকারের কথাবার্তা বা পদক্ষেপ যদি এই অংশের পছন্দের সামান্য এদিক-ওদিক হয়, তা হলে সেই সরকারের মাথায় থাবা মেরে এই অংশ বুঝিয়ে দেবে — "বাবা, ঠিক হচ্ছে না — পথে এসো!" এবং সরকারও তখন সুড়সুড় করে পথে চলে আসবে।

এই সত্যগুলি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে গেলেই যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসবে যে তা হচ্ছে — দেশের এই আসল শাসকেরা কীভাবে তাদের শাসন চালায় ও বজায় রাখে ? শুধুমাত্র কি সরকারকে দিয়েই — না কি তাদের কাছে আরও কিছু হাতিয়ার আছে ? এই যে ভারতীয় রাষ্ট্র বলি সেই রাষ্ট্র আর সরকার কি এক — অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আর রাষ্ট্র কি এক!

রাষ্ট্র ও সরকার

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ভোট হয় এবং সেই ভোটের ভেতর দিয়ে সরকার বদলোনোর একটা সুযোগ থাকে এবং সরকার বদলায়ও। কিন্তু এরই পাশাপাশি দেশের শাসন চালানোর কাজে সোজাসুজি যুক্ত এমন কতকগুলি বিভাগ আছে যেগুলির হর্তাকর্তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় না এবং সরকার বদলালেই এই সব বিভাগের হর্তাকর্তারা বদলায় না। সরকারগুলি আসে যায় — এরা কিন্তু একইরকম কাজ চালায়।

এই বিভাগগুলি হল — সরকারি আমলা বিভাগ, বিচারব্যবস্থা, এবং পুলিশ-মিলিটারি ব্যবস্থা।

একটা কথা সাধারণভাবে চালু আছে। কথাটি হল — সরকার কি মন্ত্রীরা চালায়, সরকার চালায় তো আমলারা। মন্ত্রীরা তো শুধু সই করে। কথাটা খুবই সত্যি। যারাই সরকারি প্রশাসনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন তারাই জানেন যে কোনও কিছু জানতে গেলেই মন্ত্রীদের বিভাগীয় সেক্রেটারী ইত্যাদি আমলাদের ডাকতে হয়, তাদের কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিয়ে এবং মন্ত্রীদের সব বিধি-পত্র এই সব আমলারাই সাজিয়ে গুছিয়ে দেন। এমন কি, লোকসভা বা বিধানসভায় হাজির হওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর আমলারাই তৈরি করে দেন যা সংসদে মন্ত্রীরা শুধুমাত্র পড়ে শোনান। মন্ত্রীরা সত্যি সত্যিই পুরোপুরি এই সব আমলাদের ওপর নির্ভরশীল।

এখন প্রশ্ন হল — যে সরকারই আসুক, আমলাদের তাতে কোনও অসুবিধা হয় না কেন ? তার কারণ, কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে সরকারই আসুক, সেই সরকারকে চলতে হবে এই দেশের সংবিধান মেনে যেখানে শাসন

চালানোর মূল আইনকানুনগুলি ঠিক করে দেওয়া আছে। আমলাদের কাজই হল এইসব মূল আইনকানুনগুলি প্রয়োগের ব্যাপারে দক্ষ হয়ে ওঠা — তাই এই সব দলগুলি আসলে সরকারি প্রশাসনটি চালায়। রেলমন্ত্রী বদলালে রেলমন্ত্রীর নিজস্ব নির্বাচনী কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে দু-একটা নতুন ট্রেন চালু হয় বটে, দু-একটা নতুন নতুন station-ও হয় — কিন্তু রেল প্রশাসন কিন্তু একইরকম থাকে এবং বছর বছর রেল বাজেটের বিশেষ কোনও হেরফের হয় না।

সরকার যে বিচারব্যবস্থা চালায় না এবং সরকার নিরপেক্ষভাবে যে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা এখন খুব স্পষ্ট। বাজারের কাগজি ভাষায়, এই দেশের বিচারবিভাগ এখন খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং কোনও কোনও আলোচনায় বিচারবিভাগকে সরকারের বিবেক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখন তো অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলিকে বিচারব্যবস্থা বেশ ভালোমতন কড়কে দিচ্ছে, কোথায় কোথায় সরকারগুলি সংবিধানবিরোধী কাজ করেছে তা দেখিয়ে দিচ্ছে এবং সরকারগুলির ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ভারতবর্ষের সংবিধানের মূল আইনকানুনগুলি ব্যাখ্যা করা এবং এইসব আইনকানুনের ঠিক মতন প্রয়োগ হচ্ছে কি হচ্ছে না — তার নজরদারি করাই হচ্ছে বিচারব্যবস্থার কাজ। সুতরাং বিচারব্যবস্থাও হচ্ছে এই দেশের শাসন পরিচালনার একটা অন্যতম হাতিয়ার।

আমলাতন্ত্র বা বিচারব্যবস্থার মতন পুলিশ-মিলিটারি প্রশাসনও সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলায় না — বরং যে সরকারই আসুক, সেই সরকারকে চলতে হবে পুলিশ-মিলিটারির প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে। শ্রমিক-কৃষকের ওপর গুলি চালানোর জন্য পুলিশ বা সামরিক বাহিনীকে মন্ত্রীদের অনুমোদন দরকার হয় না — দরকার হয় নিজ নিজ বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের এবং তাদের কোনও কাজ ঠিক হয়েছে কি হয়নি — তা জনগণের কাছে প্রমাণ করার জন্য তাদের সমস্ত দায়বদ্ধতা তাদের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে এবং তাদের বিভাগের আইনকানুনের কাছে যা আবার ঠিক করে দিয়েছে আমাদের দেশের সংবিধান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরকারই সমস্ত শাসনক্ষমতার অধিকারী, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। বরং সমগ্র দেশের শাসন দাঁড়িয়ে আছে চারটি খুঁটির ওপর। সেই চারটি খুঁটি হল — সরকার, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ-মিলিটারি ব্যবস্থা। এবং এই চারটি খুঁটিকে নিয়েই তো ভারতীয় রাষ্ট্র। তাই সরকার ও রাষ্ট্র এক নয় — সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের চারটি খুঁটির ভেতর একটি খুঁটি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ইতিহাসের পাতা থেকে......

রেল শ্রমিকদের স্বাধীন সংগঠন তৈরি ও লড়াই

— কাকলী দে

[১৯৭৪এর রেল ধর্মঘটের কথা সকলেই জানেন। কিছু ঘটনাটি কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ষাটের দশক থেকেই প্রতিষ্ঠিত, মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়নগুলিকে বাদ দিয়ে শ্রমিকরা নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন বানিয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন। একটা ধারাবাহিকতা কাজ করছিল। এখানে ১৯৬৬-৬৭ পর্বে Southern Railway Firemans Councilও Loco Running Staff Association নামে দুটি স্বাধীন ইউনিয়নের নেতৃত্বে দুটি বড় বড় ধর্মঘট নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। Steefen Sharlok-এর লেখা "The Indian Railways Strike of 1974 — A Study of Power and Organised Labour"-শীর্ষক বই থেকে এই ইতিহাসকে সংগ্রহ করে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। **— লেখক**]

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭৪ সালে ভারতীয় রেলে ধর্মঘট একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। কয়েক লাখ রেল শ্রমিক, মে ১৯৭৪ সালে তাঁদের কাজ বন্ধ করে দেন, যা কোথাও কোথাও ৩-৪ সপ্তাহ গিয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় রেলশিল্প অনেককাল ধরেই এককভাবে দেশের সব চাইতে বড় চাকরিদাতা ছিল। ১৯৭১ সালে ১৭

লক্ষেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ লক্ষ স্থায়ী হিসাবে এবং ৩ লক্ষেরও বেশি অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বেতনক্রমের হিসাব অনুযায়ী কর্মচারীদের প্রায় ৬০০টি কার্যকরী বিভাগে (ফাংশনাল ক্যাটাগরি) ভাগ করা ছিল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বা ক্যাটাগরি হল — Loco Running Staff (গার্ড ও ব্রেকম্যান), সিগন্যাল ও টেলি যোগাযোগ Staff। নির্মাণ, মেরামতি ও পরিষ্কারকরণের কাজের সঙ্গে অস্থায়ী এবং কন্ট্রাক্ট লেবার যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই অস্থায়ী অবস্থাতেই বহুকাল ধরে রেলশিল্পের সাথে ছিলেন, কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই কাজে মূলত মহিলা কর্মীই নিযুক্ত হতেন, যাঁদের মধ্যে আবার ১৯৭৩-৭৪ সালে ১.৩০ শতাংশ মাত্র স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সত্তর দশকের প্রথমার্ধে শ্রমিক-কর্মচারীর ৭০ শতাংশ মূলত দু'টি মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়নের ফেডারেশন বা AIRF-র তার সদস্যসংখ্যা ৫,১৪,০০০ বলে দাবি করে। অপর দিকে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ইন্ডিয়ান রেলওয়েমেন দাবি করে সদস্যসংখ্যা ৪,৪৮,০০০ বলে। NFIR-র ছিল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু AIRF-এ নানা রাজনৈতিক দলের লোকজন ছিল, যে কারণে জোনাল কমিটিগুলি মাঝে মধ্যেই ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মতের বিরুদ্ধাচরণ করত। যেমন ঘটেছিল ১৯৬৮ সালে, যখন পশ্চিম ও মধ্য রেলের AIRF-র ইউনিয়নগুলি কেন্দ্রীয় নেতাদের ডাকা ধর্মঘটে যোগ দিতে আপত্তি জানায়। AIRF-র অ্যাফিলিয়েশন ছিল সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী হিন্দ মজদুর সভা-র (HMS) সাথে এবং AIRF যুক্ত ছিল INTUC-র সাথে। এই দু'টি ফেডারেশন ছাড়াও মান্যতাপ্রাপ্ত নয় এমন কয়েকটি ইউনিয়ন ছিল, কিন্তু সেগুলির প্রভাব খুব নগণ্য ছিল।

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্যাটেগরি ইউনিয়নগুলি, যেগুলি ১৯৬০-র দশক থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং ১৯৭৪এ রেল ধর্মঘটে এক বিশাল ভূমিকা পালন করে, যদিও এই ইউনিয়নগুলি মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়ন ছিল না।

১৯৬০এর দশকের শেষভাগ থেকে management এবং মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়নগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত ও management-এর হাতের পুতুল বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির আয়ত্ত্বের বাইরে নিজস্ব ইউনিয়ন গঠন শুরু করেছিলেন। এই ইউনিয়নগুলি মূলত এক-একটি ক্যাটাগরির শ্রমিকদের নিয়েই তৈরি হচ্ছিল। এই ইউনিয়নগুলির মেরুদণ্ড হিসাবে দক্ষিণ রেলের ফায়ারম্যানদের ইউনিয়ন — ফায়ারমেন্স্ কাউন্সিল এবং United All India Loco Running Staff Association — কাজ করে।

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে মাদুরাই লোকো শেডের এক দল ফায়ারম্যান এক স্বাধীন সংগঠন — সাদার্ন রেলওয়ে ফায়ারমেন্স্ কাউন্সিল গঠন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে তাদের কার্যত বদ্ধ শ্রমিক (বন্ডেড লেবার) হিসাবে খাটানো হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই আশপাশের এলাকায় এই সংগঠনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তেই ত্রিচি এবং ওলাকাকোট বিভাগে (ডিভিশন) এর শাখা খোলা হয়। পরবর্তী ৬ মাস ধরে এলাকাগত এবং সাধারণ ক্ষোভ নিয়ে বারবার বিভাগীয় management-কে ডেপুটেশন দিতে থাকে এবং প্রতিবারই management তাকে উড়িয়ে দেয়। কাউন্সিলের নেতারা এতে মনে করলেন যেহেতু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, মুখোমুখি লড়াইএ নামার সময় উপস্থিত হয়েছে। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে দু'টি ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য রেলে, কাউন্সিল নিজেকে একটা শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়।

১৯৬৭ সালের ২৫শে জুলাই প্রথম ধর্মঘট শুরু হয়। মাদুরাই লোকো শেড্-এ কর্মরত ২০০ জন ফায়ারম্যানের মধ্যে ১৪০ জন অসুস্থতার কারণ দর্শিয়ে কাজে অনুপস্থিত হন। কাউন্সিল, ফায়ারম্যানদের বিভিন্ন ক্ষোভের এক লম্বা তালিকা নিয়ে তার লড়াই শুরু করে। তালিকার মূল point ছিল কাজের সময়, কর্মস্থলের অবস্থা, বেতন ও বিভিন্ন ভাতা এবং প্রমোশনের সুযোগ।

কাউন্সিল যেহেতু তখনও সবেমাত্র সংগঠিত হতে শুরু করেছে, তাই তারা management-র সঙ্গে তখনই মুখোমুখি ঝামেলায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। খোলাখুলি ধর্মঘটের ডাক দিলে management সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার করা, ধর্মঘট-ভাঙার মতো কাজ করত এবং শ্রমিকদের ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই খোলাখুলি ধর্মঘটের ডাক না দিয়ে, প্রত্যেক শ্রমিককে আলাদা আলাদাভাবে জানানো হয় যে — তোমাকে ইউনিয়নের দরকার — তাই অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তাদের ছুটি নিতে বলা হয়। ফায়ারম্যানরা যখন এক জায়গায় জড়ো হলেন, তখন কার্যপদ্ধতি ঘোষণা করা হল।

২৬শে জুলাইয়ের মধ্যে ত্রিচি ও মাদুরাই ডিভিশনে খবর পৌঁছে যায় এবং ত্রিচি বিভাগের বিভাগীয় সুপার

প্রেসকে জানিয়ে দেন যে ৬০০ জন ফায়ারম্যানের মধ্যে ৫১৩ জনই অনুপস্থিত। ৩রা আগষ্ট যখন ক্যাম্পেন তুলে নেওয়া হয়, তখন কিন্তু তা ওভালাকোট ও ত্রিবান্দ্রম বিভাগে ছড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ রেলের মালগাড়ি চলাচল মোটামুটিভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলও ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ক্যাম্পেন যদিও করা হয়েছিল ফায়ারম্যানদের সংগঠিত করার জন্য, অনেক চালক ও shunter-ও এতে যোগ দেন। ধর্মঘটের পক্ষে সহানুভূতিমূলক বিক্ষোভ দেখানো ও one hour প্রতীকী ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য কর্মচারীরাও তাঁদের সমর্থন জানান।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল এই অঘোষিত গণছুটির নিন্দা করে এবং মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়নগুলি এই ধর্মঘট থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। জেনারেল ম্যানেজার শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনার হুমকি দেয় এবং সাথে সাথে মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়নগুলিকে বলে ফায়ারম্যানদের কাজে যোগ দেবার ডাক দিতে। “অসুস্থ” ফায়ারম্যানদের কাজে ফেরাতে না পেরে management ধর্মঘট ভাঙার কাজ শুরু করে এবং সরাসরি দমনমূলক পদক্ষেপ নিতে শুরু করে দেয়। রেল station-র বাইরের নারকেল ও বাদাম বিক্রেতাদের দ্বিতীয় ফায়ারম্যান এবং কয়লা খালাসি ও অস্থায়ী কর্মচারীদের প্রথম ফায়ারম্যান হিসেবে কাজে পাঠানো হয়। ২৯শে জুলাই জেনারেল ম্যানেজার ধর্মঘট বেআইনি ঘোষণা করে জানান যে ২৮শে জুলাই রাত ৮টার পর গরহাজিরাকে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। management-র হুমকি সত্ত্বেও আরও বেশি সংখ্যক ফায়ারম্যান, চালক ও shunter বিক্ষোভে সামিল হতে লাগলেন।

সংসদে রেল চলাচলের বিঘ্ন হবার খবর পৌঁছোল। ফায়ারম্যানদের দাবিগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখারও আওয়াজ উঠল। রেলমন্ত্রী কথা দিলেন তিনি তাদের সমস্যাটা বিবেচনা করে দেখবেন এবং দেখবেন যাতে কারও বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার বা রেলমন্ত্রীর কাছ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও আশ্বাস না পেলে কাউন্সিল জানাল তারা ধর্মঘট তুলবেন না। দু’দিন বাদে এই আশ্বাসও পাওয়া গেলে পর ধর্মঘট তোলা হল এবং শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে শুরু করলেন।

কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই দক্ষিণ রেলের management আবার তার দাঁত-নখ বের করতে শুরু করল। কাউন্সিলের ত্রিচির ডিভিশনাল secretary ও president-কে রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। পরবর্তী এক বছরে আরও ১০-১২ জন নেতৃস্থানীয় কমরেডের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হল। management এমন কৌশল নিতে থাকল যাতে করে কাউন্সিলের রোজকার কাজ বন্ধ হতে বসল, সাথে সাথে সাধারণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে তাদের ব্যতিব্যস্ত করা হতে থাকল। এই অবস্থায় কাউন্সিল নতুনভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

কয়েকবার রেলমন্ত্রী ও উপরেলমন্ত্রীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হয়ে কাউন্সিল শেষ পর্যন্ত ৫ই জুলাই আবার একটা বিক্ষোভ কর্মসূচী নিল। অসুস্থতার নাম করে গণছুটির ডাক খোলাখুলিভাবেই দেওয়া হলো। ৮ই জুলাইএর মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ রেলের ত্রিচি, মাদুরাই, ওলাভাকোট ও মাদ্রাজ ডিভিশনে এবং দক্ষিণ-মধ্য রেলের সেকেন্দ্রাবাদ ও বিজয়ওয়াড়া ডিভিশনে। রেলের পক্ষ থেকে জানা গেল যে দক্ষিণ রেলের ৩০০০ ফায়ারম্যানদের মধ্যে ২৫০০ জন এবং দক্ষিণ-মধ্য রেলের ১৭০০ ফায়ারম্যানের মধ্যে ১৩০০ জন কাজে অনুপস্থিত। management শুরুতে চেষ্টা করল প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলোর সাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের কাজে ফেরাতে। তারপর হুমকি দিল ১০ই জুলাই রাতের মধ্যে যারা কাজে যোগ দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে “কঠিন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ” নেওয়া হবে। এতেও কাজ না হলে বিভাগীয় ম্যানেজাররা ধর্মঘট ভঙ্গকারীদের কাজে লাগাতে শুরু করল। ১০ই জুলাইএর ডেডলাইন পেরোতেই রেলওয়ে বোর্ড ঘোষণা করল লোকোগুলি চালু রাখতে টেরিটোরিয়াল আর্মি নামানো হবে।

এই অবস্থায় রাজনৈতিক নেতারা আবার ময়দানে হাজির হল ও নাক গলাতে শুরু করল। যে চারটি রাজ্য — তামিলনাডু-কর্নাটক-অন্ধ্রপ্রদেশ-কেরালা — ধর্মঘটের কবলে পড়েছিল, সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা দিল্লিতে মিলিত হলেন। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদিরিপাদকে পাঠানো হল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে, যিনি দাবিগুলি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী পরিমল ঘোষ আগেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন — ধর্মঘটীরা এখুনি কাজে যোগ দিলে সরকার নীতিগতভাবে কাউন্সিলের প্রধান দাবী কাজের সময় ১২ hours-এ বেঁধে দেওয়া মেনে নেবে। যদিও পরে প্রধান দু’টি মান্যতাপ্রাপ্ত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করে কাজের সময় ১২ hours-র বদলে ১৪ hours-এ বাঁধা হল।

ধর্মঘটকে ভাঙতে রেল বোর্ড এই চুক্তিপত্রকে কাজে লাগাল। বোর্ড জানাল এরপরেও যারা কাজে যোগ দেবে না, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যদিকে, management তার টেরিটোরিয়াল আর্মি এবং ধর্মঘটবিরোধীদের কাজে লাগাতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, এর সাথে সাথে অন্যান্য রেল শ্রমিকদের দিয়ে ফায়ারম্যানদের কাজ করানো চলতে থাকল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও দক্ষিণ রেল সূত্রে জানা গেল মাত্র ৮ শতাংশ মালগাড়ি ও যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো সম্ভব হলো।

এভাবে ধর্মঘট ভাঙার পরিকল্পনার প্রভাব পড়ল গোটা লড়াইএর ওপর। এই পর্বে সি পি এমের এক নেতা কে এ নাম্বিয়ার, যিনি রেল বোর্ড ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার কাজ করছিলেন, তিনি আন্দোলনকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন এই আন্দোলন থেকে আর কিছু পাওয়ার নেই। গুরুত্বপূর্ণ হল, কাউন্সিলের নেতারা কিন্তু লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ শেষ করতে রাজি হলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রেলমন্ত্রীকে আশ্বাস দিতে হল ধর্মঘটী শ্রমিকদের কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না; শুধু তাকে এটাও বলতে হল কাউন্সিলের যে সমস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে আগে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তিনি তাদের হয়ে রেলবোর্ডের management-র সঙ্গে কথা বলবেন। শেষ পর্যন্ত ১৮ই জুলাই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল।

এই দু'টি ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল মান্যতাপ্রাপ্ত পুরোনো ইউনিয়নগুলোর বদলে কাউন্সিলের নেতৃত্বেই ফায়ারম্যানরা সেই সময় স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে শুরু করেছিলেন। কাউন্সিল তার সমস্ত দাবি আদায় করতে না পারলেও মাইলেজ-ভাতা ইত্যাদি আদায় করতে এবং সবচেয়ে বড় কথা কাজের সময় (যা এর আগে পর্যন্ত কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না) ১৪ hours-এ বাঁধতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তার চেয়েও বড় কথা রেল শিল্পের মতো এত বড় শক্তিশালী management-র বিরুদ্ধে লড়তে নেমে নিজেদের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখা কাউন্সিলের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

লুমটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (মাঠকল)এর শ্রমিকদের লড়াই চলছে

উঃ ২৪ পরগণার টিটাগড়ের একটি জুটমিলের নাম লুমটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা মাঠকল। জুটমিলের শ্রমিকদের আন্দোলনে মাঠকল একটি পরিচিত নাম। বারবার বিভিন্ন কারণে মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে মাঠকলের শ্রমিকরা আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। ২০০২এর পর থেকে পঃবঙ্গে অন্যান্য সমস্ত জুটমিলের মত মাঠকলের শ্রমিকরাও বারবার ৫ই জানুয়ারির কালাচুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। এই কারখানার প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক কাজ করেন।

আবারও এই মাঠকল খবরের শিরোনামে চলে এসেছে। খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী মিলের একজন অফিসারকে নাকি জঙ্গি শ্রমিকরা পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। এই ঘটনার বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের কিছুটা পিছন দিকে তাকানোর প্রয়োজন। মিলটিতে management এবং প্রতিষ্ঠিত ১৪ টা ইউনিয়ন মিলে শ্রমিকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালিয়ে এসেছে বেশ কয়েকবছর যাবৎ। শ্রমিকরা মাঝেমাঝে তার প্রতিবাদও করেছে। যেমন বেশ কয়েকশো কোটি টাকা পি.এফ. এবং গ্র্যাচুইটির টাকা মিল কর্তৃপক্ষ চুরি করেছে এবং এর প্রতিবাদে অক্টোবর ২০০৭ সালে শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। management সেই আন্দোলনকে ভাঙতে বেশ কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করে। এই ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। সেই ধর্মঘট ১৭ দিন ধরে চলেছিল। এর পরে সেই আন্দোলন ভেঙে গেলেও শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামের সেই আগুন একদম নিভে যায়নি।

এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই কিছু শ্রমিক মিলে যে সমস্ত দালাল ইউনিয়ন আছে, যারা শ্রমিকস্বার্থে কাজ করছে না তাদের বিপরীতে "সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন" নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। এই সংগঠনটি প্রথম থেকেই শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াইএর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ১২ই মে পি.এফ., গ্র্যাচুইটির হিসাবের দাবিতে সাধারণ শ্রমিকরা ঐ সংগঠনের নেতৃত্বে আড়াই ঘন্টা ওয়ার্কস ম্যানেজারকে ঘেরাও করে রাখে। এই সমস্ত শ্রমিকদের চাপে পড়ে management লিখে দেয় যে সাতদিনের মধ্যে সমস্ত হিসাব দেওয়া হবে। কিন্তু এরপরেই যখন "সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন" ১৫ই মে গেটসভা করছিল তখন management-র ভাড়া করা গুণ্ডারা এসে সরাসরি ঐ সভার ওপর হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে ঐ সংগঠন থানায় অভিযোগ

জানাতে গেলে, থানার চত্বরেই শ্রমিকদের লাঠিপেটা করা হয়। ১৯ জন শ্রমিককে ঐখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। অদ্ভুতভাবে একই সময়ে ঐ গুণ্ডারা, যারা লড়াকু শ্রমিকদের গেটসভায় হামলা চালিয়েছিল তারা মিলের মধ্যে ঢুকে মিলের পারসোন্যাল ম্যানেজারকে খুন করে যায়। এই ঘটনা থেকে এবং তার পরবর্তী মালিকপক্ষ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ থেকে পরিষ্কার যে শ্রমিকদের মধ্যে ধূমায়িত ক্ষোভকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং বিপথে চালিত করার জন্য এবং বরানগর জুটমিল, মাঠকলের মালিক কুখ্যাত গোবিন্দ সারদা-র কুকীর্তি আড়াল করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটল।

জুটমিলের সমস্যাগুলো আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে কোনও একটি জুটমিলে তার সমাধান আলাদাভাবে করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। আবার আক্রমণটা যেহেতু মিলেই হচ্ছে ফলত শ্রমিকরা মিলেই তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে, যেগুলোকে আবার মালিক এবং দালালরা নানাভাবে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। জুটমিলের লড়াকু আগুয়ান শ্রমিকদের ভাবতে হবে কী করে এই অবস্থা থেকে বেরনো যায় বা এর সমাধানটা বা কী ?

অসমের ধুবড়ি জেলার ডুমুরদহে ময়দাকলে শ্রমিকদের লড়াই ভাঙতে সি আর পি এফের লাঠিচার্জ

ইউ এফ এম ইন্ডাস্ট্রিজ, অসমের ধুবড়ি ও গোলকগঞ্জের মাঝামাঝি ডুমুরদহের একটি ফ্লাওয়ার মিল। মালিক মহাবীর জৈন — কোটিপতি, অসম চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি। অথচ, তার নিজের কারখানাতেই শ্রমিকরা ময়দাকলের শ্রমিকদের জন্য সরকারের ঠিক করা ন্যূনতম বেতন পায় না। সি এস ডব্লিউ টি ইউ-র নেতৃত্বে কিছুদিন আগে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনের দাবিতে মালিকের কাছে এই শ্রমিকরা দাবিসনদ পেশ করেছিল। কিন্তু, মালিকের অনমনীয় মনোভাব ও টালবাহানা দেখে বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হয়। গত মে মাসের ২৬-২৮ তারিখে তারা তিনদিন ধরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এরপর ২৯ তারিখে যখন তারা ফের কাজে যোগ দিতে যায়, তখন মালিক তাদের কারখানায় ঢুকতে দেয় না। এবং সেই দিন থেকে কারখানায় কার্যত অঘোষিত লক আউট শুরু হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়েই management পেছন দিক দিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরের কিছু লোককে কারখানায় ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে কাজ চালু করানোর চেষ্টা করে। মালিকের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট — এই সমস্ত দালালদের দিয়ে সংগ্রামী শ্রমিকদের লড়াইকে ভাঙা, আর তাদের দিয়ে কারখানা চালু করা। দালালদের ঢোকার খবর পেয়ে সংগ্রামরত শ্রমিকরা কারখানার মেন গেট অবরোধ করে। এই অবরোধে শুধু শ্রমিকরাই নয়, তাদের পরিবারের মহিলারাও সামিল হয়। শ্রমিকদের সেই অবরোধের সামনে পড়ে দালালরা পালাতে বাধ্য হয়। এরপর, গত ২৫শে জুন মালিকপক্ষ সিকিউরিটি স্টাফদের কারখানায় ঢোকাতে চাইলে ফের সংগ্রামী শ্রমিকরা ও তাদের পরিবারের লোকজন আবার গেট অবরোধ করে। এবার মিল গেটে শ্রমিকদের এই প্রতিরোধকে ভাঙার জন্য সি আর পি এফের এক বিশাল বাহিনী শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের মহিলাদের ওপর নৃশংস লাঠিচার্জ করে। এই লাঠিচার্জে অনেকেই ভয়ঙ্করভাবে আহত হয় ও তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। সি আর পি এফের এই নৃশংস হামলার প্রতিবাদে কারখানা যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানকার গ্রামের গরিব মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা অবরোধ করে এবং সি আর পি এফের উদ্দেশ্যে ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ে। পুলিশ ও সি আর পি এফ শ্রমিকদের ও গ্রামের গরিব মানুষদের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এমনকি ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে। কিন্তু, তাতে প্রতিরোধকারীদের পিছু হটানো যায় না। ফলে, শেষ পর্যন্ত ধুবড়ি জেলার ডি এম বাধ্য হন মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে। ডি এমের মধ্যস্থতায় সহকারী লেবার কমিশনারের উপস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত মালিক বাধ্য হয় শ্রমিকদের সাথে চুক্তি করতে। চুক্তি অনুযায়ী, মালিক বাধ্য হয় সমস্ত শ্রমিককে নিয়েই কারখানা খুলতে। এলাকার গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের এরকম স্বতঃস্ফূর্ত লড়াকু ঐক্যের জোরে মালিককে বেশ কিছুটা পিছু হটাতে পারা আজকের সময়ে নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা, শ্রমিকদের ভাবনা — শ্রমিকরাই লিখছেন....

[এবার এই কলামে দু'জন শ্রমিকের লেখা দু'টি আলাদা আলাদা ছোট লেখা প্রকাশ করছি। প্রথমটি নদীয়া জেলার তাঁত শিল্পের একজন শ্রমিকের লেখা, দ্বিতীয়টি উত্তর ২৪ পরগণার একজন শ্রমিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। দ্বিতীয় লেখাটি আমরা পেয়েছি হিন্দীতে। এখানে বাঙলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করছি। বিভিন্ন জায়গার আগুয়ান, সংগ্রামী শ্রমিকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা-ভাবনা-প্রশ্ন লিখিতভাবে আমাদের কাছে পাঠান, "শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা, শ্রমিকদের ভাবনা — শ্রমিকরাই লিখছেন" এই শিরোনামে আমরা তা সমস্ত শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। — **সম্পাদকমণ্ডলী, শ্রমিক ইস্তাহার**]

নদীয়া জেলার পাওয়ারলুম শিল্পের একজন শ্রমিকের চিঠি

ইংরাজি ১৯৭৪ সাল থেকে এই ২০০৮ পর্যন্ত আমি একইভাবে পাওয়ারলুম শিল্পের সাথে যুক্ত আছি। ৩৪ বছরের আমার এই অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম, আমরা, মানে এই শিল্পের শ্রমিকরা বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত রয়েছি। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক দল যে যখন ক্ষমতায় থাকে, সে তখন ইউনিয়ন পরিচালনা করে। এবং এই হতভাগ্য শ্রমিকরা তাদের পেছনে ছোটে কিছু যদি মাইনে বাড়ে, কিছু যদি সুযোগ-সুবিধা পাই। তার ফল হয় বিপরীত, শ্রমিকরা পায় বঞ্চনা আর নেতারা ফায়দা লোটে। যেমন, ক্ষমতাসীন দল "বামপন্থী"রা অর্থাৎ সিপিআইএম ত্রিশ বছর ক্ষমতায় আছে, এই শিল্পের শ্রমিকদের শেষ করে দিয়েছে। ১৯৭৪ সালে এই শিল্পের শ্রমিকদের মাইনে ছিল মাসে ২০০ টাকা, আর সরকারি কর্মচারীদের ১০০-১৫০ টাকা। এখন শ্রমিকদের মাইনে হয়েছে ১৩০০-১৪০০ টাকা, আর সরকারি কর্মচারীদের মাইনে হয়েছে ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা। ব্যবধান কোথায় ? বাজার তো একই। আমাদের জন্য তো আর বাজার আলাদা নয়। শ্রমিকরা যখনই কোনও আন্দোলন করে, ছুটোছুটি করে, তখন কিছুটা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকদের একটু ঠান্ডা রাখে। শ্রমিকরা চায় কিছু একটা করি, কিন্তু তাকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে কমজোরি করে রাখা হয়। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই সব ইউনিয়নের নেতারা, যেমন সিটু-আইএনটিইউসি, এরা তো শ্রমিকদের মধ্যে কেউ নেতা না। এরা সবাই সরকারি চাকরি করে, তাই এদের পেটে খিদে নেই। তাই বন্ধুগণ, আমাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই নেতা হতে হবে, এবং আমাদেরটা ষোলো আনা বুঝে নিতে হবে। আগামী দিনে আমাদের এমন কিছু করতে হবে, যাতে বাঁচার মতন বাঁচতে পারি। তাতে শিল্প যদি চলে তো চলবে, আর নয়তো বন্ধ হলে হবে। এর জন্যে কোনও চিন্তা নেই। দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে, তাই শ্রমিকভাইদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। ইতি —

আমি আপনাদের একজন শ্রমিক ভাই

ইমামি লিমিটেডের বেআইনিভাবে ছাঁটাই হওয়া এক শ্রমিকের চিঠি

আমি জগদীশ তেওয়ারী, ১৩ নং বি টি রোডের ইমামি লিমিটেড কারখানার একজন শ্রমিক। ১৯৯৮ সাল থেকে এই কারখানায় কাজ করতাম। দরকার মতো কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মাঝে মাঝেই কোম্পানীর জন্য কাজে যেতে হত। নিয়মিত কাজে যেতাম, সময় মতো কারখানায় ঢুকতাম, মাথা উঁচু করে কাজ করতাম। হঠাৎ-ই ২০০৬ সালে কোম্পানী আমাকে কোম্পানীর কাজের জন্য ডেপুটেশনে পন্ডিচেরি যেতে বলে। আমার

পক্ষে অতদূর যাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। ফলে, আমি কোম্পানীকে লিখিতভাবে জানাই যে আমার পরিবারে আমি একমাত্র পুরুষ মানুষ — আমার সঙ্গে আমার বুড়ো মা থাকেন, আমার দুটো নাবালক বাচ্চা আছে, যার মধ্যে ছোটটা আবার পোলিও রোগে প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে, এদের একলা রেখে আমার পক্ষে পন্ডিচেরি যাওয়া অসম্ভব। অথচ ইমামি কোম্পানীর ম্যানেজার আমার চিঠির কোনও উত্তর না দিয়ে বারবারই মৌখিকভাবে আমাকে পন্ডিচেরি চলে যেতে বলে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাকে আমি চিঠি দিয়ে জানাই আপনি আমাকে বলুন আমাকে কত দিনের জন্য যেতে হবে। তাছাড়াও, আপনি আমাকে সময় দিন, আমি পরিবারের জন্য রেশন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে তারপর যেতে পারি। এই চিঠিরও কোনও জবাব আমাকে দেওয়া হল না। সেই একই কথা — তুমি চলে যাও। এই অবস্থা চলতে থাকার ফলে মানসিক দুশ্চিন্তায় আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। ডাক্তার দেখালে ডাক্তার ওষুধ দেওয়ার সাথে সাথে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম নিতে লিখল। ফের ডাক্তার যখন কাজে যোগ দেবার অনুমতি দিল, তখন কাজে গেলে আমাকে কাজে জয়েন করতে দিল না এবং দারোয়ান দিয়ে ধাক্কা মেরে আমাকে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হল। ফলে, আমার শরীর আরও খারাপ হতে থাকল। আবার ডাক্তার দেখানোতে ডাক্তার ছুটি নিতে বলল। ছুটি শেষে আবার কাজে গেলাম। এবারও কোম্পানী ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কারখানা থেকে বের করে দিল। এরপর, আমি মেডিক্যাল-ইএসআই ছুটিতে থাকা অবস্থাতেই management আমাকে শো-কজ করল। তখন আমি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সুশীল গোয়েঙ্কাকে লিখে জানালাম আমার ওপর কীভাবে অত্যাচার চলছে। উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং কাজ ছেড়ে দিতে বললেন। আমি বললাম — আপনি বললে আমি কাজ ছেড়ে দিতে রাজি আছি। গোয়েঙ্কা তখন আমাকে জানালেন আমি চাকরি ছেড়ে দিলে উনি আমাকে কিছু বাড়তি পয়সা দেবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম — কত বাড়তি দেবেন। তো উনি বললেন — ৬৪,০০০ টাকা দেবেন। আমি বললাম — এতে আমার পরিবারের ক'দিন চলবে ? তখন উনি আমি কত চাইছি, সেটা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম — যতদিন আমার চাকরি বাকি আছে, সেটা হিসেব করে যা দেওয়ার দিন। তাতে উনি রাজি হলেন না। তখন আমি বললাম — ইমামি কোম্পানী থেকে পিএফ-গ্র্যাচুইটি মিলিয়ে যা পাওনা হচ্ছে, তার সাথে আরও কিছু টাকা মিলিয়ে আমাকে দিয়ে দিন, আমি কাজ ছেড়ে দেব। এতে উনি রাজি হয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন কারখানা থেকে হিসেব করে নিয়ে আসতে, তাহলে উনি সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেবেন। আমি হিসাব করে নিয়ে এলাম, কিন্তু, উনি আমার সাথে আর দেখা করলেন না; ৩ ঘন্টা ধরে আমি বেকার বসে থাকার পর পিএ-র মারফৎ উনি বলে পাঠালেন, আমি যেন পরে ফোন করে যাই। এর পর আমি অন্তত পাঁচ-ছবার ফোন করেছি, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলল না। ইতিমধ্যে ইএসআই ছুটি থাকা সত্ত্বেও management আমার নামে চার্জশিট ইস্যু করল এবং Domestic Enquiry চালু করল। Illegal Enquiry চলতে থাকল। যখন ওরা দেখল জিততে পারবে না, তখন মাঝপথে Enquiry বন্ধ করে দিল এবং Enquiry Officer আমাকে Statement of Defence দিতে বলল। তখন আমি জানালাম যে PW ও Cross-Examination শেষ হয়নি — হয় Enquiry শেষ করুন অথবা নতুন EO-র ব্যবস্থা করুন। কোম্পানী কোনও কথা শুনল না এবং EO-র থেকে একতরফা রিপোর্ট বানিয়ে প্রথমে আমাকে সাসপেন্ড করল এবং তারপর চলতে চলতে আমাকে ছাঁটাই করল। এইভাবে আমার পুরো পরিবারকে ওরা শেষ হওয়ার মুখে ঠেলে দিল। আমি সমস্ত ঘটনা কোম্পানীর Chairman-President, লেবার কমিশনার এবং কারখানার দুই ইউনিয়নকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কেউই আমার অভিযোগকে গুরুত্ব দিল না। অন্যায়ভাবে ওরা আমাকে কারখানা থেকে তাড়াল।

সুভাষ রায় কর্তৃক সম্পাদিত, তুষার ভট্টাচার্য, ১৪২/৩ বিশালাক্ষীতলা রোড কলকাতা ৬০ দ্বারা প্রকাশিত এবং কমলা প্রেস ২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত